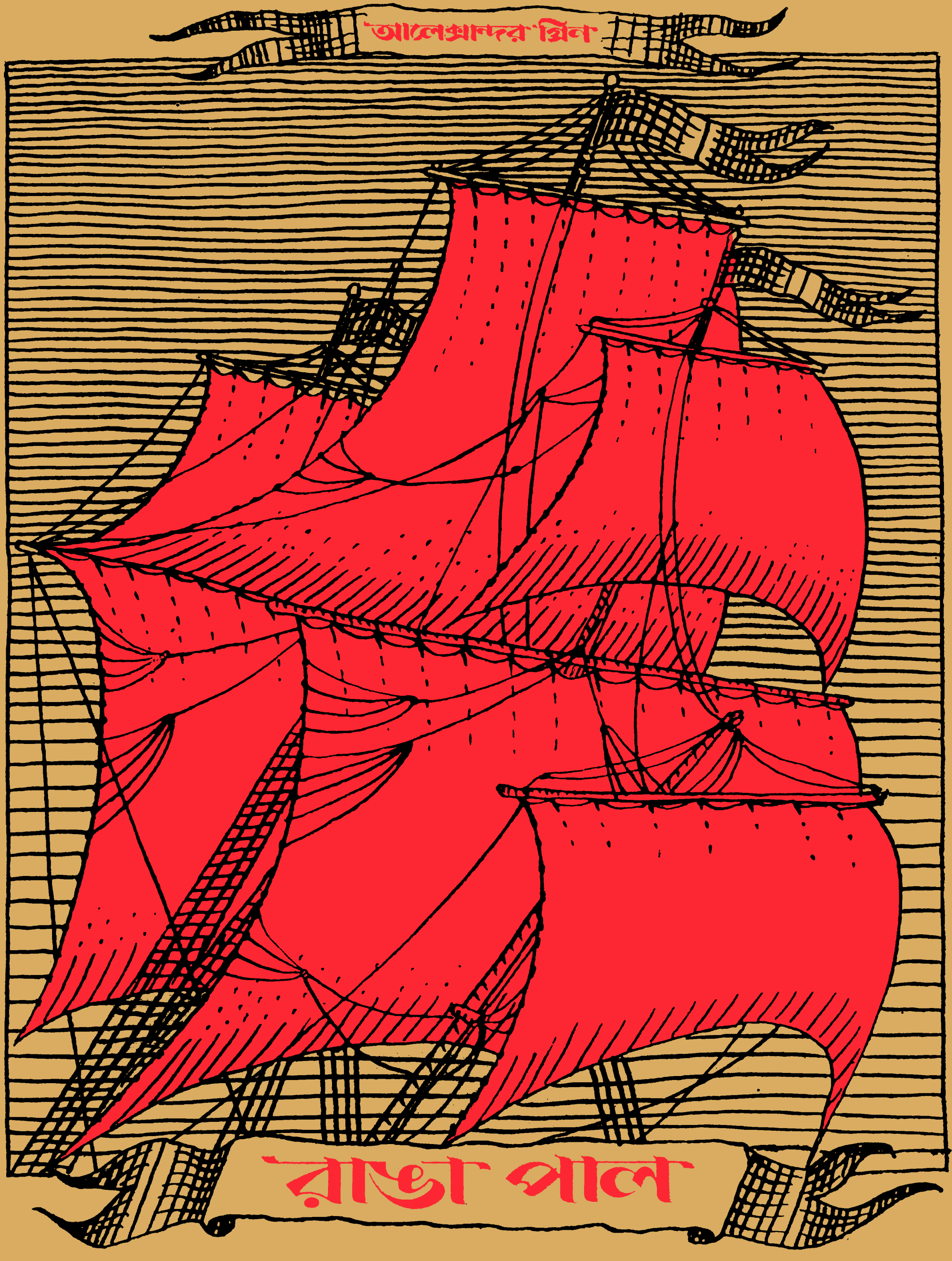

আলেক্সান্দর গ্রিন
রাঙা পাল





রাঙা পাল

গল্প সংকলন



আলেক্সান্দর গ্রিন

রাঙা পাল

গল্প সংকলন

'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: অরুণ সোম

অঙ্গসজ্জা: মিখাইল দোরখভ

Александр Грин

АЛЫЕ ПАРУСА

Повесть и рассказы

На языке бенгали

A. Grin

CRIMSON SAILS

A Collection

In Bengali

"Raduga" Publishers
17, Zubovsky Boulevard
Moscow 119021, Soviet Union

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

Г $\frac{4803010102—204}{031(01)—84}$ 265—83

সূচি

আলেক্সান্দর গ্রিনের জীবন

লেখক গ্রিন — আলেক্সান্দর স্তেপানভিচ গ্রিনেভ্স্কির মৃত্যু হয় ১৯৩২ সালের জুলাই মাসে, প্রাচীন ক্রিমিয়ায় — সুপ্রাচীন বাদাম গাছের বনাকীর্ণ এক ছোট শহরে।

গ্রিনের জীবন ছিল কঠিন। সে জীবনের মধ্যে সব কিছুই যেন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এমনভাবে গড়ে উঠেছিল যা গ্রিনকে একজন অপরাধী কিংবা হীন কূপমণ্ডূক করে তুলতে পারত। এই বিষণ্ণপ্রকৃতির মানুষটি যে কীভাবে যন্ত্রণাদায়ক অস্তিত্বের মধ্য দিয়ে বিপুল ক্ষমতাসম্পন্ন কল্পনার প্রতিভা, অনুভূতির বিশুদ্ধতা ও সলজ্জ হাসিকে অকলঙ্কিত অবস্থায় বহন করে আনেন তা দুর্বোধ্য।

বিপ্লব-পূর্ব সমাজব্যবস্থায় যে-ধরনের মানবিক সম্পর্ক ছিল আলেক্সান্দর গ্রিনের জীবনী তার বিরুদ্ধে কঠোর দণ্ডবিধান। সেকালের রাশিয়া গ্রিনকে নিষ্ঠুর পুরস্কারে পুরস্কৃত করে — শিশুকাল থেকেই ছিনিয়ে নেয় বাস্তবতার প্রতি তাঁর ভালোবাসা। পরিমণ্ডল ছিল ভয়াবহ, জীবন — দুর্বিষহ। তা ছিল বিনা-বিচারে মৃত্যুদণ্ডদানের বর্বর প্রথার সামিল। গ্রিন প্রাণে বেঁচে যান, কিন্তু বাস্তবতার প্রতি অবিশ্বাস তাঁর সারা জীবন থেকে যায়। তিনি সর্বদাই তা থেকে দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করতেন, কেননা তাঁর মতে প্রাত্যহিকতার 'গ্লানি ও আবর্জনা' নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে দুরন্ত স্বপ্নকে নিয়ে থাকা ভালো।

গ্রিন লিখতে শুরু করেন এবং তাঁর বইগুলিতে সৃষ্টি করেন প্রফুল্ল ও সাহসী লোকজন, সুরভিত বন-জঙ্গল ও সূর্যালোকে পরিকীর্ণ ধরণী, এমন এক ধরণী যা কোন মানচিত্রে নেই, আর আশ্চর্য আশ্চর্য ঘটনা, যা এক চুমুক সুরার মতো মানুষের মাথাকে ঘুরিয়ে দেয়।

মাক্সিম গোর্কি তাঁর 'পৃথিবীর পাঠশালায়' বইতে লিখেছেন: 'আমি সব সময় লক্ষ করে দেখেছি যে লোকে চিত্তাকর্ষক কাহিনী পছন্দ করে একমাত্র এই কারণে যে তার ফলে অন্তত কিছু সময়ের জন্য তাদের পক্ষে কঠিন অথচ অভ্যস্ত জীবন ভুলে থাকা সম্ভব হয়।'

এই কথাগুলি গ্রিনের ক্ষেত্রে পুরোপুরি খাটে।

তাঁর কাছে রাশিয়ার জীবন সীমাবদ্ধ ছিল সংকীর্ণ ভিয়াত্কা শহরের মধ্যে, নোংরা কারিগরি বিদ্যালয়, রাত্রিনিবাস, সাধ্যাতীত শ্রম, কারাগার আর নিত্য ক্ষুধার মধ্যে। কিন্তু ধূসর দিগন্তরেখার ওপারে কোথায় যেন ঝলমল করছে আলো, সমুদ্রের বায়ুপ্রবাহ আর প্রস্ফুটিত ঘাস ও লতাপাতায় তৈরি দেশ। সেখানে যারা বাস করে, তাদের গায়ের রঙ রোদের তাপে বাদামী — তারা সোনাখোঁচা, শিকারী, শিল্পী, অদম্য ভবঘুরে, নিঃস্বার্থ নারী, শিশুদের মতো আমুদে আর কোমল স্বভাবের, কিন্তু সর্বোপরি — নাবিক।

গ্রিন আমাদের কাছে মীমাংসার জন্য এই প্রশ্ন রেখে ইহজগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন যে তাঁর মতো প্রমত্ত স্বপ্নদ্রষ্টা হওয়া আমাদের কালে দরকার আছে কি না।

হ্যাঁ, স্বপ্নদ্রষ্টার দরকার আমাদের আছে। এই শব্দটা সম্পর্কে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মনোভাব

পরিহারের সময় এসেছে। অনেকেই এখনও স্বপ্ন দেখতে শেখে নি, আর হয়ত সেই কারণেই কালের সমপর্যায়ে উঠে দাঁড়াতে পারে না।

মানুষের কাছ থেকে যদি স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া হয় তাহলে যে-সমস্ত প্রবল প্রেরণার বশে সংস্কৃতি, শিল্প ও বিজ্ঞানের জন্ম, সেগুলির একটি, আর সুন্দর ভবিষ্যতের নামে সংগ্রামের বাসনা তিরোহিত হবে। তবে স্বপ্নকে বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে চলবে না। তার কাজ হবে পূর্বাহ্ণে ভবিষ্যৎকে অনুমান করা এবং আমাদের মনে এমন একটা উপলব্ধি সৃষ্টি করা, যেন আমরা এখনই আছি সেই ভবিষ্যতের মধ্যে, আর নিজেরাও হতে চলেছি অন্য মানুষ।

সাধারণ ধারণা এই যে গ্রিনের স্বপ্ন ছিল জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। খেয়ালি কল্পনা-বিজড়িত এবং বুদ্ধির খেলা ছাড়া আর কোন অর্থই তা বহন করে না। সাধারণ ধারণা এই যে গ্রিন ছিলেন অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনীর লেখক — বিষয়ের ওপর তাঁর দখল ছিল ঠিকই, কিন্তু তিনি এমনই এক মানুষ, যাঁর বইগুলি সামাজিক তাৎপর্যবিহীন।

কোন লেখক আমাদের উপর কী রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, কী ধরনের অনুভূতি, চিন্তা ও আচরণের উদ্রেক করে তাঁর রচনা, সে রচনা আমাদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে কি না কিংবা কৌতুকপ্রদ শব্দসমাহার রূপেই তা পঠিত হয় — এর দ্বারাই নির্ধারিত হয়ে থাকে তাঁর তাৎপর্য।

গ্রিন তাঁর রচনায় যে-জাতের মানুষের সমাবেশ ঘটিয়েছেন তারা সাহসী, শিশুর মতো সরল, আত্মসচেতন, নিঃস্বার্থ ও উদার।

এই অখণ্ড, চিত্তাকর্ষক মানুষগুলির পরিমণ্ডল রূপে আছে গ্রিনের প্রকৃতিসুলভ স্নিগ্ধ, সুরভিত বায়ু — সম্পূর্ণ বাস্তব, আর তা এমনই মনোমুগ্ধকর যে হৃদয়কে স্পর্শ করে। গ্রিনের নায়ক-নায়িকারা যে জগতে বাস করে তা অবাস্তব মনে হতে পারে একমাত্র মনের দিক থেকে নিঃস্ব মানুষের কাছে। সমুদ্র উপকূলের লবণাক্ত ও ঈষদুষ্ণ বায়ুর প্রথম ঢোকে মৃদু মাথা ঘোরার অভিজ্ঞতা যার হয়েছে সে-ই সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করতে পারবে গ্রিনের প্রাকৃতিক চিত্রের মৌলিকতা, গ্রিনের বর্ণিত দেশগুলির সুবিস্তীর্ণ শ্বাসপ্রশ্বাস।

গ্রিনের লেখা কাহিনীগুলি লোকের মনে জাগ্রত করে গবেষক, নাবিক ও ভ্রমণকারীর স্বভাবসুলভ 'সমুন্নত বোধ' এবং ঝুঁকি ও সাহসিকতায় পরিপূর্ণ বৈচিত্র্যময় জীবনের বাসনা। গ্রিনের রচনা পাঠ করার পর ইচ্ছে হয় গোটা জগৎটাকে দেখি — আর সে জগৎ গ্রিনের মনগড়া দেশ নয়, আলো, বনজঙ্গল, বন্দরের নানা ভাষা মুখরিত কোলাহল, মানবিক আবেগ-অনুভূতি ও প্রেম-প্রীতিতে পরিপূর্ণ সত্যিকারের, খাঁটি দেশ।

মহাসাগরের দ্বীপগুলিতে কোথাও এ ধরনের কোন দেশে যে প্রাণচাঞ্চল্য ও কলকোলাহল চলছে এই বিশ্বাস ছাড়া জীবন যাপন করা গ্রিনের পক্ষে ছিল দারুণ কঠিন, কখনও কখনও অসহনীয়।

বিপ্লব এলো। মানুষে মানুষে সম্পর্কের পুরনো নিষ্ঠুর ব্যবস্থা, শোষণ, সমাজ-বিচ্ছিন্নতা — যা যা গ্রিনকে পীড়া দিত তার অনেক কিছুই, যা যা তাঁকে জীবন থেকে স্বপ্ন ও গ্রন্থের জগতে পলায়নে বাধ্য করে, সে সবই বিপ্লবের ফলে নাড়া খেল।

বিপ্লবের আগমনে গ্রিন আন্তরিক আনন্দ বোধ করেন, কিন্তু বিপ্লবের ফলে যে নতুন ভবিষ্যতের জীবনায়ন হওয়ার কথা, তার অপরূপ দূরপ্রান্ত তখনও স্পষ্ট চোখে পড়ছে না, অথচ গ্রিন ছিলেন সেই শ্রেণীর মানুষ যাঁরা চিরকাল অধীরতায় ভোগেন।

বিপ্লব যখন এলো তখন তার মধ্যে আনুষ্ঠানিক পারিপাট্য ছিল না, বিপ্লব এলো ধূলিধূসরিত নগ্নপদে, এলো শল্যচিকিৎসক হয়ে। বিপ্লব হাজার বছরের পুরনো, ছাতা-ধরা জীবনযাত্রার জমিতে লাঙ্গল চালিয়ে দিল।

গ্রিনের মনে হল উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বড় বেশি দূরে, অথচ তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল এখনই, অবিলম্বে তাকে স্পর্শ করেন। তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল বৃক্ষপত্রের মর্মর আর শিশুদের কলহাস্যে মুখরিত ভাবী শহরের নির্মল বাতাসে নিশ্বাস নেন, ভবিষ্যতের লোকজনের গৃহে প্রবেশ করেন, তাদের সঙ্গে প্রলোভনজনক অভিযানে যোগ দেন, তাদের পাশে পাশে আনন্দে মুখরিত, অর্থবহ জীবন যাপন করেন।

বাস্তবে তখন-তখন এটা পাওয়া গ্রিনের পক্ষে সম্ভব হল না। কেবল কল্পনাই তাঁকে বয়ে নিয়ে যেতে সমর্থ হল বাঞ্ছিত স্থানে, অসাধারণ ঘটনা ও লোকজনের পরিমণ্ডলীতে।

অল্প বয়স থেকেই সঠিক কল্পনার উপর গ্রিনের অধিকার ছিল। তিনি যখন লেখক হলেন তখন মনে মনে কল্পনা করতেন অবাস্তব সেই সমস্ত দেশের, যেখানে তাঁর কাহিনীর ঘটনা সংঘটিত হত, কিন্তু সেগুলি কুহেলিকাচ্ছন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্য না হয়ে হত উৎকৃষ্ট অনুসন্ধানলব্ধ, শত শত বার পদদলিত স্থান।

তিনি এই সমস্ত স্থানের বিশদ মানচিত্র আঁকতে পারতেন, পথের প্রতিটি বাঁক ও উদ্ভিদকুলের চরিত্র, নদীর প্রতিটি বাঁক আর বাড়িঘরের সঠিক অবস্থান উল্লেখ করতে পারতেন; সর্বশেষে, উল্লেখ করতে পারতেন কল্পজগতের পোতাশ্রয়ে অবস্থিত প্রতিটি জাহাজের, তাদের যাবতীয় সামুদ্রিক বৈশিষ্ট্যের এবং জাহাজের নাবিকদলের নিশ্চিন্ত ও আনন্দোচ্ছল প্রকৃতির।

গ্রিন লিখেছেন: 'আমাকে উত্যক্ত করে ধরণী, তার বিশাল বিশাল সাগর-মহাসাগর, অসংখ্য দ্বীপ, আর গোপন রহস্যময়, নিদারুণ আগ্রহোদ্দীপক অঞ্চল।'

রূপকথা কেবল শিশুদেরই প্রয়োজন নয়, বয়স্কদেরও প্রয়োজন। রূপকথায় উদ্রিক্ত হয় উদ্দীপনা—মানবিক ও উন্নত আবেগ-অনুভূতির উৎস। রূপকথা আমাদের প্রশমিত হতে দেয় না, সর্বদাই দেখায় নতুন নতুন, ঝলমলে দূরপ্রান্ত, অন্য এক জীবন; রূপকথা উৎকণ্ঠিত করে তোলে এবং এই জীবনের প্রতি উদগ্র বাসনা জাগায়। এখানেই তার মূল্য এবং এখানেই মূল্য গ্রিনের রচনার সুস্পষ্ট ও প্রবল আকর্ষণের, যাকে কোন কোন সময় ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

লোকে গ্রিনের বিষয়বস্তুর অ্যাডভেঞ্চারমূলকতার কথা বলে থাকে। কথাটা ঠিকই, কিন্তু তাঁর অ্যাডভেঞ্চারমূলক বিষয়বস্তু গভীরতর এক মর্মবস্তুর খোলসমাত্র। নেহাৎ অন্ধ না হলে কেউ গ্রিনের রচনায় মানুষের প্রতি ভালোবাসার পরিচয় না পেয়ে পারে না।

গ্রিন কেবল ঐশ্বর্যময় প্রাকৃতিক চিত্রের রচয়িতা এবং বিষয়ের কারুকৃৎই ছিলেন না, তিনি একজন অতি সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ববিদও ছিলেন। তিনি নেহাৎই সাধারণ লোকজনের অন্তরে নিহিত বীরোচিত চরিত্রবৈশিষ্ট্যের কথা — আত্মত্যাগ ও পৌরুষের কথা লিখেছেন। তিনি

১০ শ্রমের প্রতি, নিজের জীবিকার প্রতি ভালোবাসা সম্পর্কে, প্রকৃতির অজ্ঞেয় রহস্য ও প্রবল ক্ষমতা সম্পর্কে লিখেছেন। গ্রিনের মতো, খুব কম লেখকই এত পরিচ্ছন্নভাবে, সযত্নে, আবেগ দিয়ে নারীর প্রতি প্রেমের প্রসঙ্গ লিখতে পেরেছেন।

সুন্দরের বর্ণাঢ্য দৃশ্যের সামনে চাঞ্চল্য বোধ করার ক্ষমতা যাদের লুপ্ত হয় নি তাদের প্রত্যেকের হৃদয়াবেগ জাগিয়ে তোলার মতো শত শত অংশ আমি এখানে তুলে দিতে পারতাম, কিন্তু তার প্রয়োজন নেই — পাঠক নিজেই সেগুলি খুঁজে পাবেন।

গ্রিন বলেছিলেন যে 'সমগ্র ধরণী, সেই সঙ্গে ধরণীতে যা কিছু আছে, সে সবই আমাদের দেওয়া হয়েছে জীবনের জন্য, যেখানে এই জীবন আছে সেখানে, সর্বত্রই তাকে স্বীকার করার জন্য।'

গ্রিন আমাদের কালের পক্ষে প্রয়োজনীয় লেখক, যেহেতু উন্নত অনুভূতি শিক্ষার কাজে তিনি তাঁর অবদান রেখেছেন, আর এই শিক্ষা ব্যতিরেকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ রূপায়ণ অসম্ভব।

কন্‌স্তান্‌তিন পাউস্তোভ্‌স্কি

রাঙা পাল

নিনা নিকলায়েভনা গ্রিনের উদ্দেশে
উপহার ও নিবেদন

লেখক

২২ নভেম্বর, ১৯২২, পেত্রোগ্রাদ

১

পূর্বসূচনা

তিনশ' টন ওজনের দুই মাস্তুলওয়ালা মজবুত জাহাজ 'ওরিওনের' নাবিক লংগ্রেন দশ বছর ঐ জাহাজে কাজ করার ফলে তার এত বেশি অনুগত হয়ে পড়েছিল যে আপন মার প্রতিও কোন ছেলের ততটা হয় না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে চাকরি ছেড়ে দিতে হল।

ঘটনাটি ঘটল এই ভাবে। বাড়িতে সে ফিরে আসত কালেভদ্রে। প্রত্যেকবারই যখন সে বাড়িতে ফিরত তখন দূর থেকেই বাড়ির চৌকাটে দেখতে পেত তার স্ত্রী মেরীকে। মেরী উদ্বাহু হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসত তার দিকে। এবারে কিন্তু সে আর মেরীকে দেখতে পেল না। তার বদলে লংগ্রেনের ছোট বাড়ির নতুন সামগ্রী — বাচ্চার ছোট খাটের পাশে — উদ্বিগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল প্রতিবেশিনী।

"তিন মাস ওর সেবাযত্ন করেছি। একবার তাকিয়ে দেখ তোমার বেটীকে," প্রতিবেশিনী বলল।

লংগ্রেনের তখন সংজ্ঞা লোপে পাবার মতো অবস্থা। সে ঝুঁকে পড়ে দেখল আট মাস বয়সের জীবটি গভীর মনোযোগের সঙ্গে তার দীর্ঘ শ্মশ্রু নিরীক্ষণ করছে। অতঃপর লংগ্রেন বসে পড়ল, মাটির দিকে চোখ নামিয়ে গোঁফ মোচড়াতে লাগল। বৃষ্টির ছাটে ভিজে গিয়েছিল তার গোঁফ।

"মেরী কবে মারা গেল?" সে জিজ্ঞেস করল।

প্রতিবেশিনী কথার ফাঁকে ফাঁকে নানা রকম বকবক করে বাচ্চা মেয়েটাকে আদর করতে করতে শোকাবহ ঘটনার বিবরণ দিল এবং সেই সঙ্গে বারবার তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল যে মেরী স্বর্গে গেছে। বিশদ ঘটনা জানার পর স্বর্গটাকে লংগ্রেনের কাছে কাঠগুদামের চেয়ে তেমন একটা আলোকোজ্জ্বল মনে হল না, আর সে মনে মনে ভাবল যে এখন তারা তিনজনে, সকলে মিলে যদি একসঙ্গে থাকত তাহলে সাধারণ বাতির আলোও অজ্ঞাত দেশে বিদায়ী ঐ নারীকে যে-আনন্দ দিত তার কোন তুলনা হয় না।

মাস তিনেক আগে অল্পবয়স্ক মা'র আর্থিক অবস্থা রীতিমতো খারাপ হয়ে পড়ে। লংগ্রেন যে টাকাপয়সা রেখে গিয়েছিল তার অর্ধেকই চলে যায় কঠিন প্রসবের পর চিকিৎসা আর নবজাতকের স্বাস্থ্যের জন্য সেবাযত্নের পেছনে; জীবনধারণের জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় যে সামান্য পরিমাণ অর্থ ছিল অবশেষে তাও হারানোর পর মেনের্সের কাছে ধার চাইতে যেতে মেরী বাধ্য হল। মেনের্স ছিল সরাইখানা ও দোকানের মালিক। সে বিত্তশালী ব্যক্তি বলে গণ্য হত।

সন্ধ্যা ছ'টার সময় মেরী তার কাছে যায়। সাতটার দিকে প্রতিবেশিনী তাকে দেখতে পায় লিসে যাবার পথে। মেরী তখন একেবারে ভেঙে পড়েছে। সে কাঁদতে কাঁদতে বলল যে বিয়ের আংটি বাঁধা দিতে শহরে যাচ্ছে। সে আরও বলল যে মেনের্স টাকা দিতে রাজী হয়েছিল বটে, কিন্তু বদলে দাবি করে ভালোবাসা। মেরীকে তাই খালি হাতে ফিরে আসতে হয়।

 প্রতিবেশিনীকে মেরী বলল, ''আমাদের ঘরে এক কণাও খাবার নেই। আমি শহরে যাচ্ছি, স্বামী ফিরে আসা পর্যন্ত মায়-মেয়ে কোন রকমে চালিয়ে নেব 'খন।''

ঐ দিন সন্ধ্যাবেলায় আবহাওয়া ছিল ঠাণ্ডা, ঝোড়ো; অল্পবয়স্কা মহিলাকে রাত করে লিসে না যাবার অনুরোধ জানিয়ে প্রতিবেশিনী ব্যর্থ হল। সে বলল, ''তুমি ভিজে যাবে মেরী, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে, এদিকে বাতাসের অবস্থা দেখে ত মনে হয় মুষলধারে বৃষ্টি নামবে।''

সমুদ্র তীরের এই গাঁ থেকে শহরে যেতে-আসতে খুব তাড়াতাড়ি পা চালালেও কম করে সময় লাগে তিন ঘণ্টা। কিন্তু প্রতিবেশিনীর পরামর্শ মেরী শুনল না। সে বলল, ''আপনাদের কাছে অমনিতেই আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছি — আর নয়। এমন প্রায় একটি পরিবারও নেই যেখান থেকে রুটি, চা বা ময়দা ধার করি নি। আঙ্টিটা বাঁধা দেব, ব্যস, চুকে যাবে।'' মেরী শহরে গেল, সেখান থেকে ফিরেও এলো, কিন্তু পরের দিন পড়ল জ্বরে, সেই সঙ্গে বিকার; দুর্যোগ আর সন্ধ্যার হিমে সে পড়ল ডবল নিউমোনিয়ার আক্রমণে — কোমল স্বভাবের মানুষ প্রতিবেশিনীটি শহর থেকে ডাক্তার ডেকে আনলে তিনি তাকে এই কথাই বললেন। এক সপ্তাহ বাদে লংগ্রেনের ডবল বিছানার খাটে জায়গা খালি হয়ে গেল, মেয়েটিকে সেবাযত্ন করা ও খাওয়ানো-দাওয়ানোর জন্য প্রতিবেশিনী উঠে এলো লংগ্রেনের ঘরে। নিঃসঙ্গ বিধবা মহিলার পক্ষে ব্যাপারটা কঠিন কিছু নয়। সে যোগ করল, ''তাছাড়া এরকম একটা আদুরে মেয়ে ছাড়া খারাপও লাগে।''

লংগ্রেন শহরে গেল, চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে বিদায় নিল এবং বাচ্চা মেয়ে আসলকে মানুষ করতে লাগল। মেয়েটা যতদিন পর্যন্ত শক্ত পায়ে হাঁটতে না শিখল ততদিন বিধবা মহিলা মা-মরা মেয়েটার মা'র জায়গা নিয়ে নাবিকের ওখানেই থেকে গেল। কিন্তু যেই দেখা গেল আসল আর চৌকাট ডিঙোতে গিয়ে পড়ছে না, তখন লংগ্রেন জোর দিয়ে জানাল যে এখন সে নিজেই মেয়েটার জন্য যা যা দরকার করতে পারবে। এই বলে সক্রিয় সমবেদনার জন্য বিধবাটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে সমস্ত চিন্তাভাবনা, আসা-ভরসা, ভালোবাসা ও স্মৃতি ছোট্ট জীবটিতে সমর্পণ করে সে নিঃসঙ্গ বিপত্নীকের জীবন যাপন করতে লাগল।

দশ বছর মুসাফিরের জীবন কাটানোর পর তার হাতে টাকাকড়ি নেহাৎই কম ছিল। সে কাজ করতে লাগল। দেখতে দেখতে শহরের দোকানগুলোতে দেখা দিল তার হাতে তৈরি খেলনা — সুনিপুণ হাতে তৈরি ছোট ছোট নৌকো, লঞ্চ, একতলা ও দোতলা পালতোলা জাহাজ, ক্রুজার ও স্টীমারের মডেল — এক কথায়, এমন সমস্ত জিনিস যা সে ঘনিষ্ঠ ভাবে জানত, আর এ কাজের প্রকৃতিই ছিল এমন যে তা কতকটা বন্দরজীবনের কলকোলাহল ও সমুদ্রযাত্রার বর্ণাঢ্য শ্রমের স্থান গ্রহণ করত। এই ভাবে পরিমিত ব্যয়ের মধ্যে জীবনযাপন করার পক্ষে যতটা প্রয়োজন ততটা লংগ্রেন উপার্জন করত। লংগ্রেন স্বভাবতই তেমন সামাজিক ছিল না, স্ত্রীর মৃত্যুর পর সে হয়ে পড়ল আরও কুনো, আরও অসামাজিক। উৎসবের সময় তাকে কখন-সখন সরাইখানায় দেখা যেত, কিন্তু সে কখনও বসত না, সে বার-কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চটপট এক গেলাস ভোদ্কা পান করে চলে যেত, যাবার সময় আশেপাশের লোকজনের যাবতীয় সম্ভাষণ ও মাথা নাড়ার উত্তরে

এপাশে-ওপাশে ছুঁড়ে যেত "হ্যাঁ" — "না" — "নমস্কার" — "চলি" — "এই কোন রকম" — এই রকম সব সংক্ষিপ্ত উক্তি। অতিথিদের সে সহ্য করতে পারত না, তাদের সে চলে যেতে বাধ্য করত নীরবে, কোন রকম জোর তাকে এ ব্যাপারে খাটাতে হত না, কিন্তু এমন ইঙ্গিত দিত আর ওজর দেখাত যে বেশিক্ষণ বসতে না পারার পক্ষে একটা কারণ দর্শানো ছাড়া আগন্তুকের আর কোন উপায় থাকত না। সে নিজেও কারও কাছে যেত না; এই ভাবে তার আর গাঁয়ের লোকজনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল একটা আবেগ-অনুভূতিহীন পর-পর ভাব, আর লংগ্রেনের হাতের কাজ — খেলনা — যদি গ্রামের কাজকর্মের উপর এতটুকুও নির্ভরশীল হত, তা হলে এ ধরনের সম্পর্কের ফল তাকে ভুগতে হত হাড়ে হাড়ে। খাবারদাবার এবং অন্যান্য সামগ্রী সে কিনত শহরে — লংগ্রেন তার কাছ থেকে এক বাক্স দেশলাই কিনেছে বলে অবধি মেনের্স বড়াই করতে পারত না। লংগ্রেন ঘরের যাবতীয় কাজও নিজে করত এবং বেশ ধৈর্য ধরে পুরুষের স্বভাব বিরোধী জটিল কৌশল — মেয়ে মানুষ করার কৌশল আয়ত্তে আনে।

আসলের বয়স যখন পাঁচ বছর তখন তার ভীরু, দরদী মুখের দিকে চেয়ে বাবার মুখে ক্রমেই ফুটতে থাকে কোমল হাসি। আসল তার বাবার কোলে বসে বোতাম আঁটা ওয়েস্টকোটের রহস্যভেদের চেষ্টা করত কিংবা মজা করে ভাঁজত জাহাজীদের গান — উৎকট ছড়া-পাঁচালী। শিশুকণ্ঠে সে সব গানে 'র' সর্বত্রই সঠিক উচ্চারিত হত না, আর মনে হত যেন নীল ফিতে দিয়ে সাজানো একটা ভালুক নাচছে। এই সময় এমন একটা ঘটনা ঘটল যার ছায়া বাপের ওপব এসে পড়ল এবং মেয়েকেও আচ্ছন্ন করল।

তখন বসন্তকাল, বসন্তের শুরু, শীতের মতোই ভয়ঙ্কর, তবে অন্য প্রকৃতির। সপ্তাহ তিনেকের জন্য ঠান্ডা মাটির ওপর সমুদ্র তীর থেকে দারুণ উত্তুরে বাতাসের ঝাপ্‌টা চলল।

জেলে-নৌকোগুলো সরিয়ে এনে রাখা হয়েছিল সমুদ্রের ধারে — সাদা বালুকারাশির ওপর তাদের কালো কালো তলদেশের দীর্ঘ সারি দেখে মনে হচ্ছিল যেন বিশাল বিশাল মাছের শিরদাঁড়া। এরকম আবহাওয়ার মধ্যে মাছ ধরতে বেরোবার মতো সাহস কারও ছিল না। গাঁয়ের একমাত্র রাস্তায় ক্বচিৎ এমন কোন লোককে দেখতে পাওয়া যায় যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। তীরের টিলাগুলি থেকে শূন্য দিগন্তের দিকে প্রবাহিত ঘূর্ণিবায়ু 'খোলা বাতাসকে' পরিণত করে তুলছিল নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক। কাপের্ণার সমস্ত বাড়ির চিমনিগুলি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ধোঁয়া ছাড়তে থাকে, বাড়ির খাড়া চালের ওপর কাঁপতে থাকে ধোঁয়ার রেখা।

কিন্তু এই উত্তুরে বাতাসের দিনগুলিতে লংগ্রেন এত ঘন ঘন তার আরামদায়ক গরম ছোট্ট বাসাটা থেকে বেরিয়ে আসতে প্রলুব্ধ হত যে পরিষ্কার আবহাওয়ার দিনে যখন সমুদ্র ও কাপের্ণার ওপর সূর্য তার ফুরফুরে সোনার চাদর বিছিয়ে দেয় তখনও তেমন হত না। লংগ্রেন দীর্ঘ সারি বাঁধা ভিত্তিস্তম্ভের ওপর খাড়া সেতুটায় এসে উঠত, এই তক্তা দেওয়া বাঁধের একেবারে কিনারায় এসে অনেকক্ষণ ধরে ধূমপান করত, বাতাসে তার পাইপের আগুন ফুঁসে উঠত, সে দেখত তীরের সামনে হাঁ-করা তলদেশ থেকে উঠছে সাদা ফেনার ধোঁয়া, বড় বড় তরঙ্গের সঙ্গে সে ফেনা কোন রকমে তাল রাখছে, আর ঝোড়ো, কালো

 প্রতিবেশিনীকে মেরী বলল, "আমাদের ঘরে এক কণাও খাবার নেই। আমি শহরে যাচ্ছি, স্বামী ফিরে আসা পর্যন্ত মায়-মেয়ে কোন রকমে চালিয়ে নেব 'খন।"

ঐ দিন সন্ধ্যাবেলায় আবহাওয়া ছিল ঠাণ্ডা, ঝোড়ো; অল্পবয়স্কা মহিলাকে রাত করে লিসে না যাবার অনুরোধ জানিয়ে প্রতিবেশিনী ব্যর্থ হল। সে বলল, "তুমি ভিজে যাবে মেরী, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে, এদিকে বাতাসের অবস্থা দেখে ত মনে হয় মুষলধারে বৃষ্টি নামবে।"

সমুদ্র তীরের এই গাঁ থেকে শহরে যেতে-আসতে খুব তাড়াতাড়ি পা চালালেও কম করে সময় লাগে তিন ঘণ্টা। কিন্তু প্রতিবেশিনীর পরামর্শ মেরী শুনল না। সে বলল, "আপনাদের কাছে অমনিতেই আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছি — আর নয়। এমন প্রায় একটি পরিবারও নেই যেখান থেকে রুটি, চা বা ময়দা ধার করি নি। আঙ্‌টিটা বাঁধা দেব, ব্যস, চুকে যাবে।" মেরী শহরে গেল, সেখান থেকে ফিরেও এলো, কিন্তু পরের দিন পড়ল জ্বরে, সেই সঙ্গে বিকার; দুর্যোগ আর সন্ধ্যার হিমে সে পড়ল ডবল নিউমোনিয়ার আক্রমণে — কোমল স্বভাবের মানুষ প্রতিবেশিনীটি শহর থেকে ডাক্তার ডেকে আনলে তিনি তাকে এই কথাই বললেন। এক সপ্তাহ বাদে লংগ্রেনের ডবল বিছানার খাটে জায়গা খালি হয়ে গেল, মেয়েটিকে সেবাযত্ন করা ও খাওয়ানো-দাওয়ানোর জন্য প্রতিবেশিনী উঠে এলো লংগ্রেনের ঘরে। নিঃসঙ্গ বিধবা মহিলার পক্ষে ব্যাপারটা কঠিন কিছু নয়। সে যোগ করল, "তাছাড়া এরকম একটা আদুরে মেয়ে ছাড়া খারাপও লাগে।"

লংগ্রেন শহরে গেল, চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে বিদায় নিল এবং বাচ্চা মেয়ে আসলকে মানুষ করতে লাগল। মেয়েটা যতদিন পর্যন্ত শক্ত পায়ে হাঁটতে না শিখল ততদিন বিধবা মহিলা মা-মরা মেয়েটার মা'র জায়গা নিয়ে নাবিকের ওখানেই থেকে গেল। কিন্তু যেই দেখা গেল আসল আর চৌকাট ডিঙোতে গিয়ে পড়ছে না, তখন লংগ্রেন জোর দিয়ে জানাল যে এখন সে নিজেই মেয়েটার জন্য যা যা দরকার করতে পারবে। এই বলে সক্রিয় সমবেদনার জন্য বিধবাটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে সমস্ত চিন্তাভাবনা, আসা-ভরসা, ভালোবাসা ও স্মৃতি ছোট্ট জীবটিতে সমর্পণ করে সে নিঃসঙ্গ বিপত্নীকের জীবন যাপন করতে লাগল।

দশ বছর মুসাফিরের জীবন কাটানোর পর তার হাতে টাকাকড়ি নেহাৎই কম ছিল। সে কাজ করতে লাগল। দেখতে দেখতে শহরের দোকানগুলোতে দেখা দিল তার হাতে তৈরি খেলনা — সুনিপুণ হাতে তৈরি ছোট ছোট নৌকো, লঞ্চ, একতলা ও দোতলা পালতোলা জাহাজ, ক্রুজার ও স্টীমারের মডেল — এক কথায়, এমন সমস্ত জিনিস যা সে ঘনিষ্ঠ ভাবে জানত, আর এ কাজের প্রকৃতিই ছিল এমন যে তা কতকটা বন্দরজীবনের কলকোলাহল ও সমুদ্রযাত্রার বর্ণাঢ্য শ্রমের স্থান গ্রহণ করত। এই ভাবে পরিমিত ব্যয়ের মধ্যে জীবনযাপন করার পক্ষে যতটা প্রয়োজন ততটা লংগ্রেন উপার্জন করত। লংগ্রেন স্বভাবতই তেমন সামাজিক ছিল না, স্ত্রীর মৃত্যুর পর সে হয়ে পড়ল আরও কুনো, আরও অসামাজিক। উৎসবের সময় তাকে কখন-সখন সরাইখানায় দেখা যেত, কিন্তু সে কখনও বসত না, সে বার-কাউন্টারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চটপট এক গেলাস ভোদ্‌কা পান করে চলে যেত, যাবার সময় আশেপাশের লোকজনের যাবতীয় সম্ভাষণ ও মাথা নাড়ার উত্তরে

এপাশে-ওপাশে ছুঁড়ে যেত "হ্যাঁ" — "না" — "নমস্কার" — "চলি" — "এই কোন রকম" — এই রকম সব সংক্ষিপ্ত উক্তি। অতিথিদের সে সহ্য করতে পারত না, তাদের সে চলে যেতে বাধ্য করত নীরবে, কোন রকম জোর তাকে এ ব্যাপারে খাটাতে হত না, কিন্তু এমন ইঙ্গিত দিত আর ওজর দেখাত যে বেশিক্ষণ বসতে না পারার পক্ষে একটা কারণ দর্শানো ছাড়া আগন্তুকের আর কোন উপায় থাকত না। সে নিজেও কারও কাছে যেত না; এই ভাবে তার আর গাঁয়ের লোকজনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল একটা আবেগ-অনুভূতিহীন পর-পর ভাব, আর লংগ্রেনের হাতের কাজ — খেলনা — যদি গ্রামের কাজকর্মের উপর এতটুকুও নির্ভরশীল হত, তা হলে এ ধরনের সম্পর্কের ফল তাকে ভুগতে হত হাড়ে হাড়ে। খাবারদাবার এবং অন্যান্য সামগ্রী সে কিনত শহরে — লংগ্রেন তার কাছ থেকে এক বাক্স দেশলাই কিনেছে বলে অবধি মেনের্স বড়াই করতে পারত না। লংগ্রেন ঘরের যাবতীয় কাজও নিজে করত এবং বেশ ধৈর্য ধরে পুরুষের স্বভাব বিরোধী জটিল কৌশল — মেয়ে মানুষ করার কৌশল আয়ত্তে আনে।

আসলের বয়স যখন পাঁচ বছর তখন তার ভীরু, দরদী মুখের দিকে চেয়ে বাবার মুখে ক্রমেই ফুটতে থাকে কোমল হাসি। আসল তার বাবার কোলে বসে বোতাম আঁটা ওয়েস্টকোটের রহস্যভেদের চেষ্টা করত কিংবা মজা করে ভাঁজত জাহাজীদের গান — উৎকট ছড়া-পাঁচালী। শিশুকণ্ঠে সে সব গানে 'র' সর্বত্রই সঠিক উচ্চারিত হত না, আর মনে হত যেন নীল ফিতে দিয়ে সাজানো একটা ভালুক নাচছে। এই সময় এমন একটা ঘটনা ঘটল যার ছায়া বাপের ওপব এসে পড়ল এবং মেয়েকেও আচ্ছন্ন করল।

তখন বসন্তকাল, বসন্তের শুরু, শীতের মতোই ভয়ঙ্কর, তবে অন্য প্রকৃতির। সপ্তাহ তিনেকের জন্য ঠাণ্ডা মাটির ওপর সমুদ্র তীর থেকে দারুণ উত্তুরে বাতাসের ঝাপ্টা চলল।

জেলে-নৌকোগুলো সরিয়ে এনে রাখা হয়েছিল সমুদ্রের ধারে — সাদা বালুকারাশির ওপর তাদের কালো কালো তলদেশের দীর্ঘ সারি দেখে মনে হচ্ছিল যেন বিশাল বিশাল মাছের শিরদাঁড়া। এরকম আবহাওয়ার মধ্যে মাছ ধরতে বেরোবার মতো সাহস কারও ছিল না। গাঁয়ের একমাত্র রাস্তায় ক্বচিৎ এমন কোন লোককে দেখতে পাওয়া যায় যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। তীরের টিলাগুলি থেকে শূন্য দিগন্তের দিকে প্রবাহিত ঘূর্ণিবায়ু 'খোলা বাতাসকে' পরিণত করে তুলছিল নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক। কাপের্ণার সমস্ত বাড়ির চিমনিগুলি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ধোঁয়া ছাড়তে থাকে, বাড়ির খাড়া চালের ওপর কাঁপতে থাকে ধোঁয়ার রেখা।

কিন্তু এই উত্তুরে বাতাসের দিনগুলিতে লংগ্রেন এত ঘন ঘন তার আরামদায়ক গরম ছোট্ট বাসাটা থেকে বেরিয়ে আসতে প্রলুব্ধ হত যে পরিষ্কার আবহাওয়ার দিনে যখন সমুদ্র ও কাপের্ণার ওপর সূর্য তার ফুরফুরে সোনার চাদর বিছিয়ে দেয় তখনও তেমন হত না। লংগ্রেন দীর্ঘ সারি বাঁধা ভিত্তিস্তম্ভের ওপর খাড়া সেতুটায় এসে উঠত, এই তক্তা দেওয়া বাঁধের একেবারে কিনারায় এসে অনেকক্ষণ ধরে ধূমপান করত, বাতাসে তার পাইপের আগুন ফুঁসে উঠত, সে দেখত তীরের সামনে হাঁ-করা তলদেশ থেকে উঠছে সাদা ফেনার ধোঁয়া, বড় বড় তরঙ্গের সঙ্গে সে ফেনা কোন রকমে তাল রাখছে, আর ঝোড়ো, কালো

 দিগন্তের দিকে সেই সব তরঙ্গ এমন গর্জন করতে করতে ধেয়ে চলেছে যেন জায়গাটা ছেয়ে গেছে কল্পজগতের কেশরওয়ালা প্রাণীদের ভিড়ে, যারা লাগাম ছিঁড়ে ক্ষেপে বেপরোয়া হয়ে গিয়ে ছুটে চলেছে দূরে কোথাও সান্ত্বনা পেতে। বিশাল বিশাল জলরাশি তোড়ে আছড়ে পড়ার হুহু আর্তনাদ, গোঙানি ও কোলাহল দেখে মনে হয় বুঝি আশপাশ ধুয়ে দেয়া দৃষ্টিগ্রাহ্য বায়ুর প্রবাহ — এতই প্রবল বেগে তা ধেয়ে চলেছে — লংগ্রেনের ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে এনে দিত একটা অসাড়তা, চাপা চাপা ভাব, যার ফলে শোক অবসিত হত ভাসা ভাসা বিষণ্ণতায়, ঠিক যেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে গভীর নিদ্রা।

এই রকম এক দিনে মেনের্সের বারো বছর বয়সী ছেলে হিন দেখতে পেল যে তার বাবার নৌকো সাঁকোর নীচে ভিত্তিস্তম্ভের গায়ে ধাক্কা খাচ্ছে, নৌকোর পাশ ভেঙেচুরে যাচ্ছে। সে বাবার কাছে গিয়ে এই সংবাদ দিল। ঝড় শুরু হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। মেনের্স নৌকোটাকে বালির ওপর উঠিয়ে আনতে ভুলে গেছে। সে তৎক্ষণাৎ জলের দিকে গেল, সেখানে দেখতে পেল বাঁধের শেষে তার দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধূমপান করছে লংগ্রেন। পাড়ে ওরা দুজন ছাড়া আর কেউ ছিল না। মেনের্স সেতুর মাঝ বরাবর গেল। জল তখন ক্ষিপ্ত হয়ে ফুঁসছে। সে জলে নেমে পালের নীচের দিকের কোণসংলগ্ন দাড়ির বাঁধন খুলল। নৌকায় দাঁড়িয়ে দুহাতে ভিত্তিস্তম্ভ ধরে ধরে সে তীরের দিকে এগোতে লাগল। দাঁড় সে ধরল না। ঠিক সেই মুহূর্তে সামান্য টলে যেতে পরের স্তম্ভটা ফসকে গেল, আর তখনই বাতাসের প্রচন্ড বেগে নৌকোর মুখ সেতুর দিক থেকে বোঁ করে ঘুরে গেল সমুদ্রের দিকে। এবারে সমস্ত শরীর বাড়িয়ে দিয়েও সবচেয়ে কাছের স্তম্ভটা ধরার সাধ্যি মেনের্সের ছিল না। বাতাস আর ঢেউ নৌকোটাকে দোলাতে দোলাতে টেনে নিয়ে চলল সর্বনাশা জলরাশির মধ্যে। বেগতিক দেখে সাঁতরে তীরে ওঠার উদ্দেশ্যে মেনের্স জলে ঝাঁপ দিতে গেল, কিন্তু তার সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়ে গেল, কেন না নৌকো ততক্ষণে ঘুরপাক খাচ্ছিল বাঁধের শেষ থেকে খানিকটা দূরে, যেখানে জলের যথেষ্ট গভীরতা আর তরঙ্গের ক্ষিপ্ততা অবধারিত মৃত্যুর প্রতিশ্রুতি বহন করছিল। মেনের্স তখন ঝড়ের টানে দূরপ্রান্তে ভেসে চলেছে। লংগ্রেন এবং মেনের্সের মধ্যে তখনও দূরত্ব দশ গজের বেশি নয় — এই দূরত্ব থেকে মেনের্সকে বাঁচানো যেত, যেহেতু সেতুর ওপর লংগ্রেনের হাতের নাগালের মধ্যেই ঝুলছিল একপ্রান্তে একটা ভারের সঙ্গে জড়ানো কাছির বান্ডিল। ঝোড়ো আবহাওয়ার সময় তীরে নৌকো ভিড়ানোর জন্য এই কাছিটি ঝোলানো থাকত, দরকার মতো সেতুর ওপর থেকে তা ছুঁড়ে দেওয়া হত।

মেনের্স মারাত্মক ভয় পেয়ে গিয়ে চিৎকার করে উঠল, "লংগ্রেন! থামের মতো দাঁড়িয়ে রইলে কেন? দেখতে পাচ্ছ না আমাকে স্রোতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে? — নোঙ্গরের কাছি ছুঁড়ে দাও!" লংগ্রেন চুপ করে রইল শান্ত দৃষ্টিতে দেখতে লাগল নৌকোয় ছটফট করছে মেনের্স। লংগ্রেনের মুখের পাইপ কেবল আরও জোরে জোরে ধূমোদ্গার করে চলছিল। কী ঘটছে তা আরও ভালো করে দেখার উদ্দেশ্যে সে ধীরেসুস্থে মুখ থেকে পাইপটা নামাল। মেনের্স আর্তকণ্ঠে বলল "লংগ্রেন! তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই! আমি মারা যেতে বসেছি, বাঁচাও!" কিন্তু লংগ্রেন ওকে একটা কথাও বলল না; মনে হচ্ছিল সে যেন মরিয়া আর্তনাদ শুনতেই পায় নি। যতক্ষণ না নৌকো এমন দূরে ভাসিয়ে নিয়ে গেল যেখান

থেকে মেনের্সের চিৎকার চেঁচামেচি ও কথাগুলি কোনরকমে এসে পৌঁছায় ততক্ষণ সে একচুলও পা নড়াল না। মেনের্স আতঙ্কে ডুকরে কেঁদে উঠল, নাবিককে কাকুতি-মিনতি করে বলল সে যেন জেলেদের কাছে ছুটে গিয়ে তাদের সাহায্যের জন্য ডেকে আনে; মেনের্স টাকাকড়ির লোভ দেখাল, ভয় দেখাল, শাপ-শাপান্ত করল, কিন্তু লংগ্রেন কেবল বাঁধের একেবারে কিনারে এগিয়ে গেল, যাতে নৌকোর ওঠাপড়া ও দুলুনি চট করে চোখের আড়াল না হয়ে যায়। মানুষ ঘরের ভেতরে বসে থাকলে ছাদ থেকে কোন আওয়াজ যেমন শুনতে পায় সেই রকম চাপা-চাপা তার কানে এসে পৌঁছুল: "লংগ্রেন, বাঁচাও!"

তখন বুক ভরে বাতাস নিয়ে, একটি কথাও যাতে হাওয়ার মধ্যে হারিয়ে না যায় সেই উদ্দেশ্যে গভীর শ্বাস ফেলে লংগ্রেন চেঁচিয়ে বলল:

"আমার বৌও তোমার কাছে এই রকমই অনুনয়-বিনয় করেছিল! এখনও, যতক্ষণ বেঁচে আছ, সেই কথা ভেবে দেখ মেনের্স, ভুলে যেও না!"

তখন চিৎকার-চেঁচামেচি শান্ত হয়ে গেল, আর লংগ্রেনও চলল বাড়ির দিকে। আসল ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখতে পেল বাবা গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে নিভন্ত বাতির সামনে বসে আছে। মেয়ে তাকে ডাকতে কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে সে তার দিকে এগিয়ে গেল। ভালো করে মেয়েকে চুমো দিল, সরে যাওয়া কম্বলটা গায়ে ঢেকে দিয়ে বলল:

"ঘুমোও সোনা আমার, ভোর হতে এখনও দেরি আছে।"

"তুমি কী করছ?"

"একটা কালো রঙের খেলনা আমি তৈরি করেছি রে আসল, ঘুমোও!"

পর দিন কাপের্ণার অধিবাসীদের মধ্যে কথাবার্তার একমাত্র বিষয়ই হল নিরুদ্দিষ্ট মেনের্স, আর ছয় দিনের দিন নিয়ে আসা হল খোদ মেনের্সকে। সে তখন মুমূর্ষু, বিদ্বেষে জ্বলছে। তার বিবরণ দেখতে দেখতে আশেপাশের গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ল। সন্ধ্যা পর্যন্ত মেনের্স হু হু করে ভেসে চলতে থাকে। ঢেউ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে অনবরত বাতুল দোকানদারটিকে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলার চেষ্টা করে। ঢেউয়ের বিরুদ্ধে ভয়ংকর লড়াইয়ের সময় নৌকোর গায়ে এবং পাটাতনের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে মেনের্স ক্ষতবিক্ষত হয়। এই অবস্থায় কাসেতগামী জাহাজ 'লুক্রেসিয়া' তাকে তুলে আনে। ঠাণ্ডা লেগে এবং আতঙ্কজনক অভিজ্ঞতার আঘাতে মেনের্সের আয়ু ফুরিয়ে গেল। সে আরও প্রায় যে আটচল্লিশ ঘণ্টা বেঁচে ছিল সেই সময়ের মধ্যে দুনিয়ায় এবং কল্পনায় যত রকমের সম্ভব বিপদ লংগ্রেনের ভাগ্যে নির্দেশ করে তার উদ্দেশে শাপ-শাপান্ত করতে থাকে। একজন নাবিক কী ভাবে মেনের্স ডুবতে চলেছে দেখেও তাকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকে, মেনের্সের এই বিবরণ কাপের্ণার অধিবাসীদের হতবাক করে দেয়; অধিকন্তু তা যখন ফলাও হয়ে প্রকাশ পায়, যেহেতু মুমূর্ষু ব্যক্তিটির নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল, সে গোঙাচ্ছিল। আর বলাই বাহুল্য, তাদের মধ্যে এমন প্রায় কেউই ছিল না যার সামর্থ্য ছিল লংগ্রেন যে-ভাবে অপমানিত হয়েছিল তার চেয়ে গুরুতর অপমানের অভিজ্ঞতা মনে করার এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে মেরীর জন্য যেমন শোকগ্রস্ত হয়ে ছিল তেমন গভীর শোকগ্রস্ত হওয়ার। লংগ্রেন যে চুপ করে ছিল এটাই তাদের কাছে মনে হয় জঘন্য, দুর্বোধ্য,

 বিস্ময়কর। মেনের্সের পেছন পেছন শেষ কথাগুলি ছুঁড়ে দেওয়ার আগে পর্যন্ত লংগ্রেন দাঁড়িয়ে ছিল চুপচাপ; দাঁড়িয়ে ছিল নিথর হয়ে। বিচারকের মতো কঠোর ও অনুচ্চ স্বরে মেনের্সের উদ্দেশে সে গভীর অবজ্ঞার ভাব ব্যক্ত করে। আর তার নীরবতার মধ্যে যে ঘৃণার চেয়েও বেশি কিছু ছিল এটা সকলেই অনুভব করছিল। সে যদি চেঁচাত, মেনের্সের হতাশা দেখে সে যদি অঙ্গভঙ্গি করে কিংবা হিংস্র উল্লাসে ছুটোছুটি করে কিংবা আরও অন্য কিছুর সাহায্যে নিজের জয়ের ভাব প্রকাশ করত তা হলে জেলেরা হয়ত তাকে বুঝলেও বুঝতে পারত। কিন্তু তার আচরণ হল অন্য রকম, ওদের মতো নয় — সে যে আচরণ করল তা জমকাল ধরনের দুর্বোধ্য, আর তার ফলে সে নিজেকে অন্যদের চেয়ে উঁচুতে তুলে ধরে, এক কথায়, এমন কাজ করে যা ক্ষমার অযোগ্য। তাকে দেখে কেউ আর সম্মান করে মাথা নোয়ায় না, করমর্দনের উদ্দেশ্যে হাত বাড়ায় না, পরিচিতের ভঙ্গিতে, অভিবাদনের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না। গ্রামে সে একেবারে চিরকালের জন্য একঘরে হয়ে গেল। বাচ্চা ছেলেরা তাকে দেখতে পেলে পিছু পিছু ধাওয়া করে চেঁচিয়ে বলে: "লংগ্রেন ডুবিয়ে মেরেছে মেনের্সকে!" এ ব্যাপারে সে মনোযোগ দিত না। সরাইখানায় কিংবা সমুদ্রতীরে, নৌকোগুলোর মাঝখানে সে উপস্থিত হলে লোকে সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্তকে দেখলে যে রকম করে সেইভাবে জেলেরা যে একপাশে সরে গিয়ে চুপ করে যেত তাও যেন সে লক্ষ্যই করত না। লোকসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার যতটুকু বাকি ছিল মেনের্স সংক্রান্ত ঘটনার পর তা পূর্ণ হল। বিচ্ছিন্নতা পরিপূর্ণ হয়ে উদ্রেক করল গভীর পারস্পরিক ঘৃণা, যার ছায়া আসলের উপরও এসে পড়ল।

মেয়েটি বড় হতে লাগল বন্ধুবান্ধবহীন অবস্থায়। তার বয়সী বিশ-পঁচিশটি ছেলেমেয়ে কাপের্ণায় বাস করত। তারা ছিল জলে ভেজা স্পঞ্জের মতো অমার্জিত পারিবারিক শিক্ষায় টৈটম্বুর। তাদের শিক্ষার ভিত্তি ছিল বাবা-মার অনপনেয় প্রভাব। দুনিয়ার তাবৎ শিশুর মতো অনুকরণপ্রিয় এই ছেলেমেয়েরা চিরকালের জন্য ছোট্ট আসলকে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও মনোযোগের ক্ষেত্র থেকে বাদ দিয়ে রাখল। বলাই বাহুল্য, এটা ধীরে ধীরে ঘটতে থাকে বড়দের তিরস্কার ও বকাবকির ফলে। শেষকালে কড়া নিষেধের রূপ ধারণ করে, অতঃপর রটনায় ও আজেবাজে গুজবে তা জোরদার হয়ে ওঠে, শিশুমনে পল্লবিত হয়ে ওঠে নাবিকের বাড়ির প্রতি ভীতি।

তায় আবার লংগ্রেনের কুনো জীবনযাত্রার ধরনের ফলে এখন যত রাজ্যের উদ্ভট উদ্ভট গালগল্পের আগল মুক্ত হয়ে গেল। নাবিকের সম্পর্কে লোকে বলাবলি করতে থাকে যে সে নাকি কোথায় কাকে খুন করে, তার ফলেই নাকি তাকে আর জাহাজের চাকরীতে নেওয়া হয় না, আর লোকটা নিজে যে বিষণ্ণ ও অসামাজিক তার কারণ হল সে "অপরাধজনিত বিবেকের দংশনে ভুগছে"। খেলার সময় আসল যদি ছেলেমেয়েদের কাছে ঘেঁষতে আসত তা হলে তারা তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিত, নোংরা-কাদা ছুঁড়ে মারত, এই বলে তার পেছনে লাগত যে তার বাবা মানুষের মাংস খেয়েছে, আর এখন বানাচ্ছে জাল টাকা। সাদা মন নিয়ে ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্য একে একে যে-সমস্ত চেষ্টা সে করে সেগুলির সমাপ্তি ঘটে করুণ কান্নায়, কালশিটেতে আর আঁচড়ে এবং জনমতের অন্যান্য অভিব্যক্তিতে। শেষ পর্যন্ত অপমানিত হওয়ার প্রবৃত্তি তার আর রইল

না। তাহলেও বাবাকে সে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করত: "আচ্ছা বল ত লোকে আমাদের ভালোবাসে না কেন?" লংগ্রেন বলত, "ওঃ, আসল রে, ওরা কি ভালোবাসতে জানে? ভালোবাসতে জানা চাই, সেই ক্ষমতাটাই ত ওদের নেই।" "জানা — সেটা কী রকম?" "এই এরকম!" বলেই সে মেয়েকে কোলে তুলে নিত, মেয়ের বিষণ্ণ চোখজোড়ার ওপর গাঢ় চুম্বন এ'কে দিত। স্নেহ লাভের পরিতৃপ্তিতে আসলের চোখ বুজে আসত।

সন্ধ্যাবেলা কিংবা উৎসবের দিনে, যখন আঠার কৌটো, যন্ত্রপাতি এবং অসমাপ্ত কাজ সরিয়ে রেখে, এপ্রন খুলে বাবা দাঁতের ফাঁকে পাইপ চেপে বিশ্রাম করতে বসত তখন তার কোলে গিয়ে ওঠা এবং বাবার হাতে আগলানো চৌহদ্দির মধ্যে পাক খেতে খেতে খেলনার নানা অংশ স্পর্শ করা, সেই সঙ্গে সেগুলির কোনটা কী কাজে লাগে জিজ্ঞেস করা — এই ছিল আসলের প্রিয় আমোদ। এই ভাবে শুরু হয় জীবন ও লোকজন সম্পর্কে এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাল্পনিক বিষয় বর্ণনা — আর সেই বর্ণনার মধ্যে লংগ্রেনের আগেকার জীবনধারার কল্যাণে প্রধান স্থান অধিকার করে আকস্মিক সমস্ত ঘটনা, মোটের ওপর যাকে বলা চলে আকস্মিকতা — অদ্ভুত অদ্ভুত, বিস্ময়কর ও অসাধারণ ঘটনা। লংগ্রেন তার মেয়েকে জাহাজের দড়িদড়া, পাল আর সমুদ্রযাত্রায় নিত্যব্যবহার্য সামগ্রীর নাম উল্লেখ করতে গিয়ে ধীরে ধীরে গভীর ভাবনায় ডুবে যেত, জিনিসপত্রের ব্যাখ্যা থেকে চলে যেত এমন সব প্রসঙ্গে যেখানে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করত কখনও কপিকল, কখনও স্টিয়ারিং হুইল, কখনও মাস্তুল অথবা কোন এক ধরনের নৌকো ইত্যাদি, আর এগুলির পৃথক পৃথক বর্ণনা থেকে প্রসঙ্গ পালটে চলে যেত সমুদ্রপথে ভ্রমণের বিস্তৃত ছবিতে — সে তখন বাস্তব ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে-পালটে দিত তার অন্ধসংস্কার আর নিজের কল্পনার মূর্তির সঙ্গে — বাস্তব ঘটনা। এইখানেই দেখা যেতে লাগল জাহাজ দুর্ঘটনার বার্তাবহ বাঘ-বিড়াল, কথা-বলিয়ে উড়ুক্কু মাছ, যার নির্দেশ না শোনার অর্থ পথ ভুল করা, ফ্লাইং ডাচম্যান জাহাজ আর তার ক্ষিপ্ত খালাসীদল, নানা রকম লক্ষণ, ভূতপ্রেত, জলকন্যা, জলদস্যু — এক কথায়, শান্ত সমুদ্রের বুকে অথবা প্রিয় পানশালায় যে-সমস্ত গালগল্প বলে নাবিকেরা তাদের অবসর কাটায়। লংগ্রেন এছাড়াও বলত জাহাজডুবীর ফলে বিপদগ্রস্ত লোকজনের কাহিনী, এমন সমস্ত লোকের কথা, যারা বুনো হয়ে গেছে, কথা বলা ভুলে গেছে, বলত গুপ্তধনের গল্প, সশ্রম কারাদণ্ডভোগীদের বিদ্রোহ এবং এমন আরও বহু কাহিনী যেগুলি মেয়েটা এত মনোযোগ দিয়ে শুনত যে নতুন মহাদেশ সম্পর্কে কলম্বাসের বিবরণও বোধহয় প্রথম বার লোকে অত মনোযোগ দিয়ে শোনে নি। লংগ্রেন যখন গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে চুপ করে যেত তখন আসল তাড়া দিয়ে বলত: "বল, বল!" শেষ কালে সে তার বাবার বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ত, আশ্চর্য আশ্চর্য স্বপ্ন এসে ভিড় করত তার ঘুমের মধ্যে।

তাকে বড় রকমের এবং বৈষয়িক দিক থেকে সব সময় গুরুত্বপূর্ণ পরিতৃপ্তি দিত আরও একটি ঘটনা — শহরের খেলনার দোকানের কর্মচারীর আগমন। শহরের খেলনার দোকান সানন্দে লংগ্রেনের বানানো খেলনা কিনত। দোকানের কর্মচারীটি বাপকে খুশি রাখার জন্য এবং বাড়তি কিছু দাঁও মারার মতলবে মেয়েটার জন্য নিয়ে আসত একজোড়া আপেল, মিষ্টি পিঠে জাতীয় জিনিস, একমুঠো বাদাম। লংগ্রেন দরাদরি পছন্দ করত না, তাই সে সচরাচর খাঁটি দাম বলত, কিন্তু দোকান-কর্মচারীটি কমাতে বলত। "এঃ বললেই

হল," লংগ্রেন বলত, "আমি এক সপ্তাহ ধরে বসে বসে এই বোট বানিয়েছি।" বোটটা ছিল ইঞ্চি ছয়েক মাপের। "দেখ দেখি কী মজবুত, তাছাড়া কত গভীর জলেই না চলতে পারে, আর কী গড়ন! এই বোট যে কোন আবহাওয়ায় পনেরোটা মানুষের ভার সহ্য করতে পারবে।" শেষ পর্যন্ত হত এই যে মেয়েটি চুপচাপ আপেল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে গুনগুন করে গান গাইতে থাকায় লংগ্রেন আর নিজের গোঁ বজায় রাখতে পারত না, তর্ক করার প্রবৃত্তিও তার থাকত না; তাকে হার মানতে হত, আর দোকান-কর্মচারীটিও সুন্দর সুন্দর, মজবুত খেলনায় ঝুড়ি ভর্তি করে নিয়ে গোঁফের ফাঁকে মুচকি হাসতে হাসতে প্রস্থান করত।

বাড়ির যাবতীয় কাজকর্ম লংগ্রেন নিজে করত: কাঠ কাটত, জল আনত, উনুন ধরাত, রান্না করত, জামাকাপড় কাচত, ইস্ত্রি করত, এসবের মধ্যেই আবার সময় করে টাকা রোজগারের জন্য কাজও করত। আসলের বয়স যখন আট বছর পূর্ণ হল তখন তার বাবা তাকে পড়তে ও লিখতে শেখাল। বাবা তাকে মাঝে মাঝে সঙ্গে করে শহরে নিয়ে যেতে লাগল, পরে দোকান থেকে টাকা আনার কিংবা জিনিস দোকানে পেঁাছে দেওয়ার দরকার পড়লে তাকে একাই পাঠাতে শুরু করল। ব্যাপারটা যে প্রায়ই ঘটত তা নয়, যদিও লিস ছিল কাপের্ণা থেকে মাত্র চার মাইল দূরে, কিন্তু সেখানে পথ গেছে বনের মধ্য দিয়ে; আর বনে শারীরিক বিপদ ছাড়াও আরও অনেক কিছু আছে যা বাচ্চাদের ভয় পাইয়ে দিতে পারে। অবশ্য শারীরিক বিপদ শহরের এত কাছাকাছি দূরত্বের মধ্যে প্রায় ঘটেই না, তবু ধরে রাখতে বাধা নেই। এই কারণে একমাত্র ভালো দিনগুলিতে, সকালে, যখন নিবিড় অরণ্যের চারপাশের পথ সূর্যের আলোর বন্যায়, ফুলে আর নীরবতায় এমনভাবে ভরপুর থাকে যাতে ভূতপ্রেতের কল্পনায় সংবেদনশীল আসল ভীত না হয়ে পড়ে, তখন লংগ্রেন তাকে শহরে ছাড়ত।

একদিন শহরের দিকে এ রকম এক যাত্রার মাঝখানে মেয়েটি পথের ধারে বসল সকালের খাবার জন্য ঝুড়িতে যে পিঠে রাখা ছিল তা খাবার উদ্দেশ্যে। খেতে খেতে সে খেলনাগুলো হাতড়ে হাতড়ে দেখছিল; সেগুলির মধ্যে দুটো-তিনটে তার কাছে নতুন ঠেকল। লংগ্রেন সেগুলিকে বানিয়েছিল রাতের বেলায়। এই রকম একটা নতুন খেলনা ছিল ছোট্ট একটা নৌকো। সাদা নৌকোটাতে ছিল রেশমী কাপড়ের ছাঁট থেকে তৈরি রাঙা পাল খাটানো। এরকম কাপড়ে লংগ্রেন সচরাচর বড়লোক খদ্দেরের জন্য তৈরি জাহাজের কেবিন মুড়ে থাকে। এক্ষেত্রে, মনে হচ্ছে, নৌকো তৈরি করার পর পালের উপযুক্ত কাপড় না পেয়ে সে হাতের কাছে যা পেয়েছে তা-ই — অর্থাৎ লাল রেশমের টুকরো ব্যবহার করেছে। আসল মুগ্ধ হয়ে গেল। খুশিভরা, জ্বলন্ত রঙ তার হাতের মধ্যে এমন উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে লাগল যে মনে হচ্ছিল সে যেন আগুন ধরে রেখেছে। পথ গেছে ছোট নদীর ওপর লগি ফেলে পাতা একটা সাঁকোর ওপর দিয়ে। ডাইনে বাঁয়ে জলের ধারা চলে গেছে বনের ভেতরে। আসল মনে মনে ভাবল, 'এটাকে যদি আমি জলে নামিয়ে দিয়ে একটু ভাসাই তাহলে ত আর ভিজে নষ্ট হয়ে যাবে না। আমি পরে মুছে শুকিয়ে নেব।' এই ভেবে সাঁকোর ওপারে বনের ভেতরে জলস্রোতের মুখের দিকে সরে গিয়ে সে সন্তর্পণে তীরের একেবারে কাছাকাছি জায়গায় জলে ছাড়ল তার সাধের তরণীটি। পালগুলি তৎক্ষণাৎ স্বচ্ছ জলে

লাল রঙের প্রতিফলন ফেলে ঝলকে উঠল; কাপড় ভেদ করে আলো কাঁপা কাঁপা গোলাপী রশ্মি ফেলল জলের তলাকার সাদা পাথরের বুকে। "তুমি কোথা থেকে এসেছ ক্যাপ্টেন?" কল্পিত ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল আসল। তারপর নিজেই নিজেকে জবাব দিয়ে বলল: "আমি এসেছি... এসেছি... চীন থেকে এসেছি আমি।" "কী এনেছ তুমি?" "কী এনেছি তা বলব না।" "আচ্ছা, এই রকম করছ তুমি ক্যাপ্টেন! তাহলে কিন্তু আমি তোমাকে ফের ঝুড়িতে পুরে রেখে দেব।" ক্যাপ্টেন সবে শান্তভাবে জবাব দিতে যাবে যে সে ঠাট্টা করছিল, এখন সে হাতি দেখানোর জন্য প্রস্তুত, এমন সময় পারের কাছের জলের শান্ত ধারা হঠাৎ ছুটে সরে গিয়ে নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে তাকে টেনে নিয়ে গেল মাঝনদীতে, আর সত্যিকারের নৌকোর মতো তীর ছেড়ে ভরবেগে ওটা ঠিক যেন ভেসে চলল স্রোতের উজানে। মুহূর্তের মধ্যে দৃশ্য বস্তুর আয়তন বদলে গেল: আসলের কাছে এখন জলের ধারাটাকে মনে হল বিশাল এক নদী, আর নৌকোটা যেন দূরের এক বড় জাহাজ। আসল জলে প্রায় পড়তে পড়তে ভয় পেয়ে তাড়াহুড়ো করে সে দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। 'ক্যাপ্টেন ভয় পেয়ে গেছে,' এই ভেবে সে ভেসে যাওয়া খেলনাটার পেছন পেছন ছুটল। তার আশা ছিল ওটা তীরের কোথাও না কোথাও এসে ঠেকবে। ঝুড়িটা ভারী না হলেও তার অসুবিধা সৃষ্টি করছিল। ওটাকে টেনে নিয়ে তাড়াতাড়ি চলতে চলতে আসল বারবার বলতে লাগল: "হা ভগবান! কী যে হল..." সুন্দর তেকোনা পাল তরতর করে ছুটছে। ওটা যাতে চোখের আড়াল না হয়ে যায় এই চেষ্টা করতে গিয়ে আসল হোঁচট খায়, পড়ে যায়, আবার ছোটে।

বনের ভেতরে এত গভীরে আসল এর আগে আর কখনও যায় নি। খেলনাটাকে ধরার অধীর আগ্রহ তার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হওয়ায় সে এপাশে ওপাশে দৃষ্টি দিতে পারছিল না। সে যেখানে ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছিল সেই তীরের কাছেই মনোযোগ আকর্ষণ করার মতো যথেষ্ট বাধাবিপত্তি ছিল। উপড়ে পড়া গাছের ছাতলা ধরা গুঁড়ি, গর্ত, উঁচু উঁচু ফার্নগাছ, বনগোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা ও বাদাম গাছের ঝোপঝাড় পদে পদে বাধা সৃষ্টি করছিল। সে সব বাধা অতিক্রম করতে গিয়ে সে ধীরে ধীরে শক্তি হারিয়ে ফেলছিল, আরও ঘন ঘন থেমে থেমে দম নিচ্ছিল কিংবা মুখের ওপর থেকে চটচটে মাকড়সার জাল ঝেড়ে ফেলছিল। আরও প্রশস্ত জায়গায় হোগলা ও নলখাগড়ার ঝোপঝাড় যখন একনাগাড়ে চলতে লাগল তখন পালের লাল ঝলক আসলের চোখের প্রায় আড়ালে চলে গেল, কিন্তু স্রোতের বাঁকটার পাশ কাটিয়ে যেতেই সে আবার তা দেখতে পেল, দেখতে পেল নৌকোটা সমান, অবিচলিত গতিতে দূরে সরে যাচ্ছে। একবার সে পিছু ফিরে দেখল। বিশাল বনভূমি, পাতার ফাঁকে ফাঁকে আলো পড়ার ফলে ধোঁয়া-ধোঁয়া কুন্ডলী, থেকে থেকে গহন আঁধারের কালো-কালো ফাটল মিলে বিচিত্র দৃশ্য বালিকাকে গভীর বিস্ময়ে অভিভূত করে ফেলল। মুহূর্তের জন্য তার ভয়-ভয় লাগল, কিন্তু পরক্ষণেই খেলনার কথা মনে পড়ে যেতে সে কয়েকবার গভীর নিশ্বাস নিয়ে "ফু-ফু" আওয়াজ ছেড়ে প্রাণপণে ছুটল।

এইভাবে মনে মনে উদ্বেগ নিয়ে বৃথাই ধাওয়া করতে করতে ঘণ্টাখানেক কেটে যাওয়ার পর আসল অবাক হলেও স্বস্তি বোধ করল এই দেখে যে সামনের গাছপালা সহজেই দুভাগ হয়ে সরে গিয়ে সমুদ্রের নীল ধারা, মেঘ আর হলুদ বালির খাড়া পাড়ের জন্য পথ করে

 দিয়েছে। আসল শ্রান্ত হয়ে প্রায় পড়ে যেতে যেতে ছুটে সেই পাড়ের ওপর গিয়ে উঠল। এখানে ছিল নদীর মোহানা। জলধারা এখানে এত অপ্রশস্ত ও অগভীর যে স্রোতে-ধোয়া পাথরের নীল আভা পর্যন্ত নজরে আসছিল। নদী গিয়ে মিশেছে সামনের সাগরের ঢেউয়ের মধ্যে। গাছের শিকড়ে-শিকড়ে এবড়োখেবড়ো অনুচ্চ খাড়া পাড় থেকে আসল দেখতে পেল নদীর ধারে একটা বিরাট চেটালো পাথরের ওপর তার দিকে পেছন ফিরে বসে আছে একটা লোক। ফেরারী নৌকোটাকে হাতে ধরে সে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এমন কৌতূহল নিয়ে সেটাকে দেখছে যেন কোন হাতি প্রজাপতি ধরতে পেরে তাকে দেখছে। খেলনাটা যে গোটা আছে এতেই কতকটা সান্ত্বনা পেয়ে আসল খাড়া পাড় বয়ে নেমে পড়ল এবং অজানা লোকটির কাছাকাছি এগিয়ে গিয়ে তাকে বোঝার চেষ্টায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল, অপেক্ষা করতে লাগল কখন সে মাথা তোলে। কিন্তু অজানা লোকটি অরণ্যের বিস্ময়কর দানের কথা ভাবতে ভাবতে এমনই বিভোর হয়ে ছিল যে বালিকা ততক্ষণে তার আপাদমস্তক ভালো করে দেখার পর এই স্থির সিদ্ধান্তে এসে উপস্থিত হল যে এই অজানা মানুষটির মতো আর কোন মানুষ এর আগে একবারও তার চোখে পড়ে নি।

কিন্তু ওর সামনে যিনি ছিলেন তিনি আর কেউই নন — পদব্রজে ভ্রমণরত এগ্‌ল — গান, পুরাকাহিনী, উপকথা ও রূপকথার খ্যাতনামা সংগ্রাহক। সাদা চুলের গোছা থরে থরে নেমেছে তাঁর খড়ের টুপির নীচ দিয়ে; নীল প্যাণ্টের তলায় গোঁজা ছাইরঙা ঢিলে কামিজ আর উঁচু বুট দেখে তাঁকে মনে হচ্ছিল যেন শিকারী; সাদা কলার, টাই, কোমরবন্ধ, রুপোয় বাঁধানো বকলস, নিকেলের নতুন ছোট্ট তালা লাগানো ব্যাগ আর ছড়িতে প্রকাশ পাচ্ছিল তাঁর শহুরে পরিচয়। তাঁর মুখ — অবশ্য গজগজে, খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর ভয়ঙ্কর শিঙের মতো উঁচিয়ে থাকা জমকাল গোঁফজোড়ার আড়াল থেকে উঁকি-মারা নাক, ঠোঁট আর চোখকে যদি মুখ বলা যায় — মনে হতে পারত মিয়ানো আর স্বচ্ছ বলে, যদি না থাকত বালির মতো ধূসর ও ইস্পাতের মতো ঝকঝকে চোখজোড়া আর সে চোখের সাহসদীপ্ত ও তীব্র দৃষ্টি।

"এবারে আমাকে দিয়ে দাও," বালিকা ইতস্তত করে বলল। "তোমার খেলা হয়ে গেছে। ওটাকে ধরলে কী করে বল ত?"

আসলের উত্তেজিত রিনরিনে কণ্ঠস্বর এত আকস্মিক শোনাল যে এগ্‌ল মাথা তোলার সময় তাঁর হাত থেকে নৌকোটা পড়ে গেল। বৃদ্ধ মৃদু হাসতে হাসতে এবং ধীরে ধীরে তাঁর শিরা-ওঠা বিশাল হাতের মুঠোর মধ্যে দাড়ি ধরে এক মিনিটের জন্য মেয়েটিকে নিরীক্ষণ করলেন। বহু ধোপের ধকল-সওয়া ছিটের ফ্রকটায় তার রোদে-পোড়া সরু সরু ঠ্যাঙের হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা পড়েছে কি পড়ে নি। লেসের রুমাল দিয়ে গোছানো তার ঘন কালো চুলের রাশি বিস্রস্ত হয়ে কাঁধ স্পর্শ করছে। আসলের প্রতিটি ভঙ্গিতে ছিল সোয়ালো পাখির ওড়ার মতো একটা লঘু ও পরিচ্ছন্ন ভাবব্যঞ্জনা। বিষণ্ণ প্রশ্নের ছায়াঘন তার গভীর কালো চোখ দুটো যেন মুখের তুলনায় ভারিক্কি; রীতিবিরুদ্ধ নরম উপবৃত্তাকার সেই মুখের ওপর ছড়ানো ছিল এমন এক ধরনের চমৎকার পোড়াটে আভা যা চামড়ার স্বাস্থ্যোজ্জ্বল শুভ্রতার পক্ষে স্বাভাবিক। আধখোলা ছোট্ট ঠোঁটজোড়ার ফাঁকে ঝকঝক করছে অমায়িক হাসি।

"গ্রিম, ইশপ আর অ্যান্ডারসনের নামে দিব্যি করে বলছি," একবার মেয়েটির দিকে আরেকবার নৌকোটার দিকে তাকাতে তাকাতে এগ্‌ল বললেন, "এ কোন একটা বিশেষ ধরনের দেখছি! এই যে শোন ত, এটা কি তোমার জিনিস?"

"হ্যাঁ, আমি সারাটা নদীর পার ধরে এর পেছন পেছন দৌড়েছি; ভেবেছিলাম, আমি বুঝি মারাই যাব। ওটা কি এখানে ছিল?"

"ঠিক আমার পায়ের কাছে। জাহাজডুবির কারণে সমুদ্রতীরের জলদস্যু হিশেবে আমি তোমাকে এই পুরস্কারটা দিতে পারছি। খালাসীর দল নৌকোটাকে ছেড়ে চলে যায়; এমন অবস্থায় তিন আঙুল সমান ঢেউয়ের ধাক্কায় এটা আছড়ে এসে পড়ে বালির ওপর — আমার বাঁ পায়ের গোড়ালি আর লাঠির ডগার মাঝখানে।" এই বলে তিনি ছড়িটা ঠুকলেন। "কী নাম তোমার বল ত?"

"আসল," এগ্‌লের হাত থেকে খেলনাটা নিয়ে ঝুড়ির ভেতরে লুকিয়ে রাখতে রাখতে বালিকা বলল।

"ভালো কথা," এই বলে বৃদ্ধ চোখ না ফিরিয়ে এক দুর্বোধ্য ভাষণ দিয়ে চললেন। তাঁর চোখের গভীরে ঝলক দিচ্ছিল প্রসন্ন মেজাজের অমায়িক মৃদু হাসি। তিনি বললেন: "সত্যি বলতে গেলে কি, তোমার নাম জিজ্ঞেস করার কোন দরকার আমার ছিল না। ভালো, যে নামটা এমন অদ্ভুত, তীরের শন্‌শন্‌ কিংবা সমুদ্রের শাঁখের আওয়াজের মতো এমন একলয়ের, সুরেলা; তোমার নাম যদি শুনতে মিষ্টি অথচ অসহ্য রকমের একঘেয়ে হত, সুমধুর অজানার পক্ষে বেমানান হত তাহলেই বা আমার কী করার ছিল? তা ছাড়া তুমি কে, কে তোমার বাপ-মা, তোমার জীবনই বা কী রকম — এ সব জানার ইচ্ছে আমার নেই। এই মুগ্ধতা নষ্ট করা কেন? আমি এই পাথরটার ওপর বসে বসে ফিন্‌ ও জাপানী আখ্যানবস্তুর তুলনামূলক চর্চা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম... এমন সময় হঠাৎ নদীর জল ছিটকে ফেলল এই নৌকোটাকে, তারপর এলে তুমি।... তুমি ঠিক যেমনটি, সেই রূপে। সোনার মেয়ে আমার, আমি কিন্তু মনে মনে কবি — যদিও নিজে কখনও কবিতা লিখি নি। তোমার ঝুড়িতে কী আছে?"

"নৌকো," আসল ঝুড়িটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "তাছাড়া আছে জাহাজ, আর নিশানওয়ালা তিনটে ছোট ছোট বাড়ি। সেখানে থাকে সেপাইরা।"

"চমৎকার। তোমাকে ওগুলো বিক্রি করতে পাঠানো হয়েছিল। পথে তুমি খেলায় মেতে উঠলে। নৌকোটাকে জলে একটু ভাসাতে গেলে, অমনি সেটা ছুট দিল। তাই ত?"

"তুমি কি সত্যি সত্যিই দেখেছ?" সন্দিগ্ধ সুরে জিজ্ঞেস করল আসল, মনে মনে ভাবার চেষ্টা করল সে নিজে এই ব্যাপারটা বলেছে কিনা। "কেউ তোমাকে বলেছে নাকি? নাকি তুমি আন্দাজে বলছ?"

"আমি জানতাম।"

"কী ভাবে জানতে?"

"কারণ এই যে আমি হলাম সবচেয়ে বড় যাদুকর।"

আসল ভেবাচেকা খেয়ে গেল। এগ্‌লের এই কথায় তার উদ্বেগ ভীতির সীমানা ছাড়িয়ে গেল। সমুদ্রের নির্জন তীর, নিস্তব্ধতা, নৌকো নিয়ে হয়রানির একশেষ, বৃদ্ধের দুর্বোধ্য

 ভাষণ, তাঁর চকচকে চোখ, তাঁর জমকাল কেশরাশি ও শ্মশ্রু বালিকার কাছে বাস্তবতার সঙ্গে অলৌকিকতার এক সংমিশ্রণ বলে মনে হতে লাগল। এখন এগ্‌ল কোন রকম মুখভঙ্গি করলে কিংবা চেঁচিয়ে একটা কিছু বললেই হল — আসল ভয়ে অবসন্ন হয়ে, কাঁদতে কাঁদতে ছুটে পালিয়ে যায় আর কি! কিন্তু আসলের চোখ দুটি বিস্ফারিত হতে দেখে এগ্‌ল ঝট্‌ করে ভঙ্গি পালটে ফেললেন।

"আমাকে দেখে তোমার ভয় পাবার কিছু নেই," গম্ভীর স্বরে তিনি বললেন। "বরং উলটো, আমি চাই তোমার সঙ্গে একটু প্রাণ খুলে কথাবার্তা বলতে।"

ঠিক এই সময় তিনি উপলব্ধি করলেন বালিকার মুখের মধ্যে কী এমন জিনিস আছে যা তাঁর মনে এত গভীর ছাপ ফেলেছে। তিনি মনে মনে ভাবলেন, 'এ হল পরম সৌভাগ্যের, সুন্দরের এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রত্যাশা। আঃ, আমি লেখক হয়ে জন্মালাম না কেন? কী চমৎকার প্লট!'

"আচ্ছা শোন," এগ্‌ল প্রথম যেখান থেকে শুরু করেছিলেন সেটাকে একটা সম্পূর্ণ রূপ দেওয়ার চেষ্টায় বলে চললেন (নিত্যকার কাজের ফলে পুরাকাহিনীর প্রতি তাঁর যে ঝোঁক তা অজানা জমিতে বিরাট স্বপ্নের বীজ নিক্ষেপের আশঙ্কার চেয়েও তীব্র ছিল), "আচ্ছা শোন আসল, আমার কথা মন দিয়ে শোন। তুমি সম্ভবত, যেখান থেকে আসছ সেই গাঁয়ে, মানে কাপের্ণায়, আমি গিয়েছিলাম। আমি রূপকথা আর গান ভালোবাসি, তাই সারাদিন ঐ গাঁয়ে বসে থাকি যা কেউ কখনও শোনে নি এমন কিছু শুনতে পাবার আশায়। কিন্তু তোমাদের ওখানে লোকে রূপকথা বলে না, গান গায় না। আর যদি কেউ কোন গল্প বলে এবং গান গায় তা হলে বুঝলে কিনা, সেগুলোর বিষয়বস্তু হবে ধূর্ত চাষী আর সৈন্যদের কীর্তিকান্ড, তাদের চুরি বাটপারির নিত্য সুখ্যাতি, তা হবে না-ধোয়া পায়ের মতো নোংরা, পেটের ভেতরের গরগর আওয়াজের মতো অসভ্য, বিশ্রী সুরের চারটি করে ছোট ছোট পদের গান।... দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি গুলিয়ে ফেললাম। আবার প্রথম থেকে বলি।"

খানিকটা ভেবে নিয়ে তিনি বলে চললেন:

"জানি না কত বছর কাটবে, তবে কাপের্ণায় পল্লবিত হয়ে উঠবে একটিই রূপকথা— বহুকাল মনে রাখার মতো রূপকথা। তুমি বড় হবে, আসল। এক দিন সকাল বেলায় সমুদ্রের দূরে প্রান্তে সূর্যের আলোয় ঝলক দেবে রাঙা পাল। রাঙা পালে জ্বলজ্বলে প্রকান্ড সাদা জাহাজ ঢেউ কেটে এগিয়ে আসবে সোজা তোমার দিকে। এই আশ্চর্য জাহাজটা শান্তভাবে ভাসতে ভাসতে আসবে, সেখান থেকে কোন রকম চিৎকার-চেঁচামেচি, গুলিগোলার আওয়াজ উঠবে না। তীরে জমায়েত হবে বহু লোক, তারা আশ্চর্য হবে, হাঁ হয়ে যাবে। তুমিও সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে। জাহাজ চমৎকার বাজনার তালে তালে জমকাল ভঙ্গিতে এগিয়ে আসবে একেবারে তীরের দিকে, সেখান থেকে গালিচা, সোনা আর ফুলে ফুলে সাজানো একটা চটপটে নৌকো ভাসতে থাকবে জলের বুকে। "তোমরা কেন এলে? কার খোঁজ করছ তোমরা?" তীরের লোকেরা জিজ্ঞেস করবে। তখন তুমি দেখতে পাবে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে সুন্দর চেহারার এক সাহসী রাজপুত্র, সে তোমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। "এই যে আসল!" সে বলবে। "এখান থেকে অনেক অনেক

দূরে আমি তোমাকে স্বপ্নে দেখেছি, এসেছি তোমাকে চিরকালের জন্যে আমার রাজ্যে নিয়ে যেতে। তুমি ওখানে আমার সঙ্গে বাস করবে গভীর গোলাপী উপত্যকায়। তুমি যা চাইবে তা-ই পাবে; তুমি আর আমি এমন মিলেমিশে আর ফুর্তিতে থাকব যে চোখের জল ও বিষাদ কাকে বলে তা তোমার মন জানতে পারবে না।" সে তোমাকে নৌকোয় বসাবে, জাহাজে নিয়ে আসবে, তুমি চিরকালের জন্য চলে যাবে আলোর দেশে, যেখানে তোমাকে আসার জন্য অভিনন্দন জানাতে সূর্য ওঠে মাথার ওপর, তারারা নেমে আসে আকাশ থেকে।"

"এসব কি আমাকে বলছ?" বালিকা মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল।

আসলের ভাবগম্ভীর চোখে ফুটে উঠল আস্থার ভাব, খুশির ঝলক। বিপজ্জনক যাদুকর হলে নিশ্চয়ই অমন কথা বলত না। সে আরও কাছে এগিয়ে গেল।

"আচ্ছা, হয়ত ওটা... ঐ জাহাজটা এখনই এসে গেছে?"

"এত শিগ্‌গির নয়," এগ্‌লে আপত্তি করে বললেন, "ঐ যে আমি বললাম, আগে তুমি বড় হবে। তারপর... বলাবলির কী আছে? এটা হবে, হবেই। তখন তুমি কী করবে?"

"আমি?" সে ঝুড়ির ভেতরটা দেখল, কিন্তু সম্ভবত সেখানে উপহার দেবার যোগ্য কোন জিনিস খুঁজে পেল না। "আমি ওকে ভালবাসতাম," সে তড়বড় করে বলল, তারপর খানিকটা ইতস্তত করে যোগ করল, "অবশ্য যদি মারামারি না করে।"

"না, মারামারি করবে না," যাদুকর রহস্যের ভঙ্গিতে চোখ টিপে বললেন, "করবে না, এর জন্য আমি দায়ী থাকব। যাও খুকী, দুই ঢোক সুগন্ধী ভোদ্‌কা আর কয়েদীদের গান সম্পর্কে ভাবনাচিন্তার ফাঁকে যে কথাগুলো তোমাকে বললাম তা ভুলে যেও না। যাও। তোমার ফুরফুরে মাথার ওপর শান্তি ঝরে পড়ুক!"

লংগ্রেন তার ছোট্ট সবজি বাগানে কাজ করছিল, সে নিড়ানি দিচ্ছিল আলুর ঝাড়ে। মাথা তুলতে সে দেখতে পেল আসল ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে তার দিকে, আসলের চোখেমুখে খুশি আর অসহিষ্ণুতার ছাপ।

"এই যে..." দম নিতে নিতে সে বলল, সঙ্গে সঙ্গে দুহাতে আঁকড়ে ধরল বাবার গায়ের এপ্রন। "শোন, একটা কান্ড হয়েছে, তোমাকে বলব।... ঐখানে, দূরে, নদীর ধারে বসে আছে এক যাদুকর..."

সে শুরু করল যাদুকর আর তার কৌতূহলজনক ভবিষ্যদ্বাণী দিয়ে। ভাবনাগুলো এত তাড়াহুড়ো করে বেরোচ্ছিল যে ঘটনাটা ধীরেসুস্থে গুছিয়ে বলা তার পক্ষে অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। প্রথমে যাদুকরের চেহারার বর্ণনা তার পরে চলল হাতছাড়া নৌকোর পেছনে ছোটার বিবরণ।

লংগ্রেন বাধা না দিয়ে গম্ভীর মুখে মেয়ের কথা শুনে গেল। তার কথা শেষ হওয়ার পর লংগ্রেনের কল্পনায় চটপট আঁকা হয়ে গেল অজ্ঞাত পরিচয় বৃদ্ধ, যার এক হাতে সুগন্ধী ভোদ্‌কা আর অন্য হাতে খেলনা। লংগ্রেন মুখ ফিরিয়ে নিল, কিন্তু শিশুদের জীবনের বড় বড় ঘটনার বেলায় বড় মানুষকে যে গম্ভীর থেকে আশ্চর্যের ভাব প্রকাশ করতে হয়, একথা মনে পড়ে যেতে সে গাম্ভীর্যের সঙ্গে মাথা নাড়ল, আর বলল:

 "বটে বটে; সমস্ত রকম লক্ষণ থেকে মনে হয় যাদুকর না হয়ে যায় না। লোকটাকে একবার দেখতে পেলে হত।... তবে হ্যাঁ, তুই আবার যখন যাবি তখন পাশে মোড়-টোড় নিস না; বনের ভেতরে পথ হারিয়ে ফেলা বিচিত্র কিছু না।"

কোদাল ফেলে দিয়ে সে শুকনো ডালপালায় তৈরি নীচু বেড়া ঘেঁষে বসে মেয়েকে কোলে বসাল। মেয়ে ভয়ঙ্কর পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। সে বিশদ আরও কিছু যোগ করার চেষ্টা করছিল, কিন্তু গরমে, উদ্বেগে ও দুর্বলতাবশত তার ঘুম পেয়ে গেল। তার চোখ বুজে এলো, মাথা ঢলে পড়ল বাবার কঠিন কাঁধের ওপর, আর এক মুহূর্তের মধ্যে সে স্বপ্নের দেশে ভেসে যায় আর কি, এমন সময় হঠাৎ একটা সন্দেহ মাথায় ঢুকতে উদ্বিগ্ন হয়ে আসল চোখ বোজা অবস্থায়ই ধড়মড় করে উঠে বসল, হাতের ছোট মুঠিতে বাপের গায়ের ওয়েস্ট কোটের ওপর ভর দিয়ে জোরে বলল:

"তোমার কী মনে হয়, যাদু-জাহাজ কি আমাকে নিতে আসবে?"

"আসবে," শান্তস্বরে জবাব দিল নাবিক, "তোকে যখন বলেছে তখন সত্যিই আসবে।"

সে মনে মনে ভাবল: 'বড় হলে ভুলে যাবে। এখন তোর কাছ থেকে এই খেলনাটা কেড়ে নেওয়া ঠিক হবে না। ভবিষ্যতে তোকে দেখতে হবে অনেক কিছু — **রাঙা নয়,** নোংরা আর হিংস্র পাল; দূর থেকে দেখে মনে হবে পরিপাটি, সাদা ধবধবে, কাছে এলে—শতচ্ছিন্ন, নির্লজ্জ। পথ চলতি একজন লোক আমার মেয়ের সঙ্গে ঠাট্টা করেছে। তাতে আর কী আছে? ভালো ঠাট্টা! ঠাট্টা বটে! দ্যাখ দেখি, তোকে কী হয়রানই না করে ফেলেছে — দিনের অর্ধেক বনের ভেতরে, ঘন জঙ্গলের মধ্যে। আর রাঙা পালের ব্যাপারে বলি কি, আমি যেমন ভাবছি তেমনি করে ভাবিস: তাহলেই রাঙা পাল তোর মিলবে।'

আসল ঘুমিয়ে পড়েছিল। লংগ্রেনের যে হাতটা খালি ছিল সে হাতে পাইপ তুলে নিয়ে সে ধূমপান করতে লাগল। সবজি বাগানের বাইরের দিকে যে ঘন ঝোপঝাড় গজিয়েছিল, কঞ্চির বেড়ার ফাঁক দিকে ধোঁয়া গিয়ে প্রবেশ করল সেখানে। ঝোপের পাশে বেড়ার দিকে পিঠ করে বসে অল্পবয়সী একটা ভিখিরি পিঠে চিবুচ্ছিল। বাপ-মেয়ের কথাবার্তা তার মেজাজ খুশি করে তুলল, আর ভালো তামাকের গন্ধে সে চুলবুল করে উঠল শিকারের জন্য।

"এই গরিব বেচারিকে একটু তামাক দাও গো কত্তা," লোকটা বেড়ার ডালপালার ফাঁক দিয়ে বলল। "তোমার তামাকের কাছে আমার তামাক কিসসু নয়, বলা যেতে পারে বিষ।"

"তোমাকে দিতাম বটে," নীচু গলায় লংগ্রেন জবাব দিল, কিন্তু আমার তামাক আছে জামার ঐ পকেটে। দেখতেই ত পাচ্ছ, মেয়েটার ঘুম ভাঙাতে মন চাইছে না।"

"কপাল আমার! জেগে উঠলে উঠবে, আবার ঘুমিয়ে পড়বে, পথ-চলতি মানুষ না হয় একটু তামাক খেতে পেত।"

লংগ্রেন আপত্তি করে বলল, "কিন্তু তোমার যে একেবারে তামাক নেই তা ত নয়, এদিকে বাচ্চাটা হয়রান হয়ে পড়েছে। নেহাৎই যদি চাও ত পরে এসো।"

ভিখিরি অবজ্ঞা ভরে থুতু ফেলল, লাঠির আগায় পুঁটুলিটা তুলে নিয়ে বিষোদ্‌গার করে বলল:

"বুঝলাম, রাজকন্যে কিনা। সাগরের যত রাজ্যের জাহাজ-টাহাজ দিয়ে ওর মাথাটা ত খেয়েছে! ওঃ, একটা আজব চিজ বটে! তুমি কিনা আবার বাড়ির কত্তা।"

"শোন রে," লংগ্রেন ফিসফিস করে বলল, "ওকে হয়ত জাগাতেই হবে, কেবল তোর ঐ পেল্লায় ঘাড়ে আচ্ছা করে রন্দা কষানোর জন্যে। গেলি এখান থেকে!"

আধ ঘণ্টা বাদে দেখা গেল ভিখিরিটা জনা দশেক জেলের সঙ্গে সরাইখানায় টেবিলের ধারে বসে আছে। তাদের পেছনে বসে আছে কিছু লম্বা-চওড়া মেয়েলোক। তাদের ভুরু ঘন, হাতগুলো পথ-বাঁধানো পাথরের মতো গোল গড়নের। তারা থেকে থেকে তাদের স্বামীদের জামার আস্তিনে টান মারছে, কখন-কখন তাদের কাঁধের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে তুলে নিচ্ছে ভোদ্‌কার গেলাস — বলাই বাহুল্য, নিজেদের জন্য। ভিখিরি রাগে গরগর করতে করতে জানাল:

"...আমাকে তামাক দিলই না। বলে কিনা, "তুই যখন সাবালিকা হবি তখন বিশেষ একটা লাল জাহাজ আসবে।... তোকে নিতে। কেন না ভাগ্যে আছে, রাজপুত্রের সঙ্গে তোর বিয়ে হবে। আর ঐ যাদুকরকে বিশ্বাস করিস।" এদিকে আমি বলি: "ওকে জাগাও, জাগাও, তামাক বার কর দেখি।" তাতে ও দূর দূর করে আমার পেছন পেছন অর্ধেক পথ তাড়া করল।"

"কে? কী ব্যাপার? কিসের কথা হচ্ছে?" কৌতূহলী মেয়েদের গলা শোনা গেল।

জেলেরা তাদের মাথা খানিকটা ঘুরিয়ে বাঁকা হাসি হেসে স্পষ্ট করে বলল:

"লংগ্রেন আর তার মেয়ে ক্ষেপে গেছে, হয়ত ওদের বুদ্ধিসুদ্ধিই লোপ পেয়ে গেছে; এই ত এ বলছে। শুনে মনে হচ্ছে ওদের বাড়িতে কোন গুনিন-টুনিন এসেছিল। নজর রেখো গো খুড়ি-মাসীরা, ওরা অপেক্ষা করছে কখন সাগর পার থেকে রাজপুত্তুর আসবে, আবার আসবে নাকি রাঙা পালতোলা জাহাজে চেপে!"

তিন দিন বাদে শহরের দোকান থেকে ফেরার পথে আসল এই প্রথম শুনতে পেল:

"ওরে জল্লাদের মেয়ে! আসল! এদিকে চেয়ে দ্যাখ! রাঙা পাল ভাসছে।"

বালিকা চমকে উঠল, নিজের অজানতেই হাত উঠিয়ে সূর্য থেকে চোখ আড়াল করে সমুদ্রের জলধারার দিকে তাকাল। তারপর যে দিক থেকে ডাক আসছিল সে দিকে ফিরে তাকাল; সেখানে তার বিশ পা তফাতে দাঁড়িয়ে ছিল এক গাদা ছেলেমেয়ে; তারা নানা রকম মুখভঙ্গি করছিল, জিভ দেখাচ্ছিল। আসল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাড়ির দিকে ছুটল।

২

গ্রে

সীজারের মতে যদি এই হয় যে রোমে দ্বিতীয় ব্যক্তি হওয়ার চেয়ে গাঁয়ে প্রথম ব্যক্তি হওয়া ভালো তাহলে সীজারের প্রাজ্ঞ বাসনা প্রসঙ্গে আর্থার গ্রে তাঁকে ঈর্ষা নাও করতে পারে। সে ক্যাপ্টেন হয়ে জন্মায়, ক্যাপ্টেন হওয়া তার বাসনা ছিল এবং ক্যাপ্টেন সে হয়ও।

যে বাড়িতে গ্রের জন্ম সেই বিশাল বাড়িটা ভেতরে নিরানন্দ, বহিরঙ্গে মহিমান্বিত দালানের সদরের সামনের দিকে এসে মিলেছে পার্কের একাংশ ও ফুলের কেয়ারি। লন্-এ নিছক খেয়ালে ছুঁড়ে দেওয়া কণ্ঠমালার মতো সারি সারি দুলত রুপোলি-নীল, গোলাপী আভা মেশানো কালো, বেগনী — নানা রঙের সেরা সেরা জাতের টিউলিপ ফুল। হোগলার বনের ভেতর দিয়ে আঁকাবাঁকা নদীর ধারার ওপর ছড়িয়ে পড়া আধা অন্ধকারের মধ্যে ঝিমুত পার্কের প্রাচীন গাছগুলি। দুর্গটার চারধারে, যেহেতু এটা ছিল সত্যিকারের এক দুর্গ, সেই হেতু তার চারধারে ছিল পাকানো ঢালাই লোহার থামের সঙ্গে যোগ করা লোহার কারুকাজের বেষ্টনী। প্রতিটি থামের মাথার শেষে ছিল ঢালাই লোহার জমকাল লিলি ফুল; উৎসব-অনুষ্ঠানের দিনে এই লিলির আকারের বাটিগুলি তেলে পূর্ণ করা হত, রাতের অন্ধকারে অনেকখানি জায়গা জুড়ে দপদপিয়ে জ্বলত আলোর সারি।

গ্রের মা-বাবা নিজেদের অবস্থা ও সম্পদের এবং এমন এক সমাজের নিয়মকানুনের অহঙ্কারী গোলাম ছিলেন যার প্রসঙ্গ উঠলে তাঁরা উল্লেখ করতে পারতেন "আমরা" বলে। তাঁদের হৃদয়ের যে অংশটি পূর্বপুরুষদের প্রতিকৃতির গ্যালারি জুড়ে আছে তাকে ঐ রূপের ঠিক যোগ্য বলা চলে না; অন্য অংশ — গ্যালারির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার কল্পনা—শুরু হয় শিশু গ্রেকে দিয়ে, পূর্বনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী যার নিয়তি হল এমন ভাবে জীবনযাপন করা ও মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া যাতে কুলমর্যাদার কোন হানি না ঘটিয়ে দেয়ালে ঝুলতে পারে তার প্রতিকৃতি। এই পরিকল্পনার মধ্যে একটা ছোট গলদ থেকে গিয়েছিল: জন্ম থেকেই আর্থার গ্রের হৃদয়টা ছিল এত প্রাণবন্ত যে বংশধারার নির্ধারিত পন্থানুসরণে বিন্দুমাত্র প্রবণতা তার দেখা গেল না।

বালকের এই প্রাণচাঞ্চল্য, এই সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক রুচির প্রভাব তার আট বছর বয়সেই পড়তে থাকে; খেয়ালী কল্পনাপ্রবণ বীরব্রতীর ধরনধারণ, সন্ধানী ও অলৌকিক কর্মস্রষ্টার বিশিষ্ট ধরন, অর্থাৎ জীবনের অসংখ্য বিচিত্র ভূমিকার মধ্য থেকে সবচেয়ে বিপজ্জনক ও আবেগপূর্ণ ভূমিকা — মহাপুরুষের ভূমিকা গ্রহণকারী ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য গ্রের মধ্যে লক্ষ করা যায় অনেক আগে থাকতেই, যখন দেয়ালের ধারে চেয়ার রেখে ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টের ছবির নাগাল পেয়ে খ্রীষ্টের রক্তাক্ত হাত থেকে সে পেরেক টেনে বার করে অর্থাৎ চুনকাম মিস্ত্রীর কাছ থেকে সরানো নীল রঙ দিয়ে হাত দুটো স্রেফ লেপে দেয়। ছবিটির এই রূপ তার কাছে অপেক্ষাকৃত সহনীয় মনে হয়েছিল।

মৌলিকতাপূর্ণ এই কাজে মুগ্ধ হয়ে সে অতঃপর ক্রুশবিদ্ধ খ্রীস্টের পায়েও প্রলেপ লাগাতে প্রবৃত্ত হল, এমন সময় ধরা পড়ে গেল বাবার কাছে। বালককে কান ধরে চেয়ার থেকে টেনে নামিয়ে বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন:

"ছবিটা নষ্ট করলি কেন?"

"আমি নষ্ট করি নি।"

"এটা একজন বিখ্যাত শিল্পীর কাজ!"

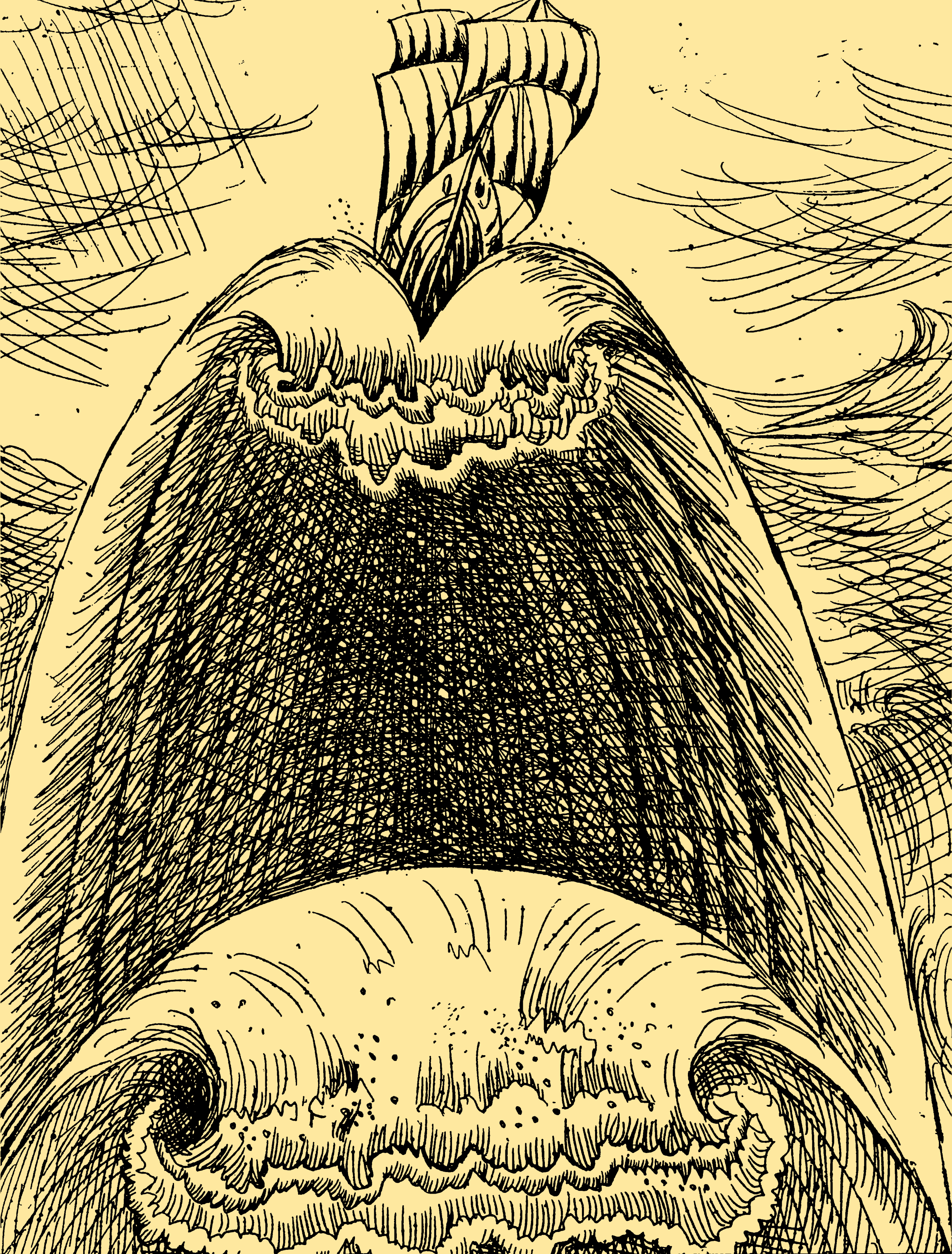
"আমার তাতে কী?" গ্রে বলল। "আমার চোখের সামনে হাত ফুঁড়ে পেরেক বেরিয়ে থাকবে আর রক্ত ঝরতে থাকবে এ আমি সহ্য করতে পারব না। এটা আমি চাই না।"

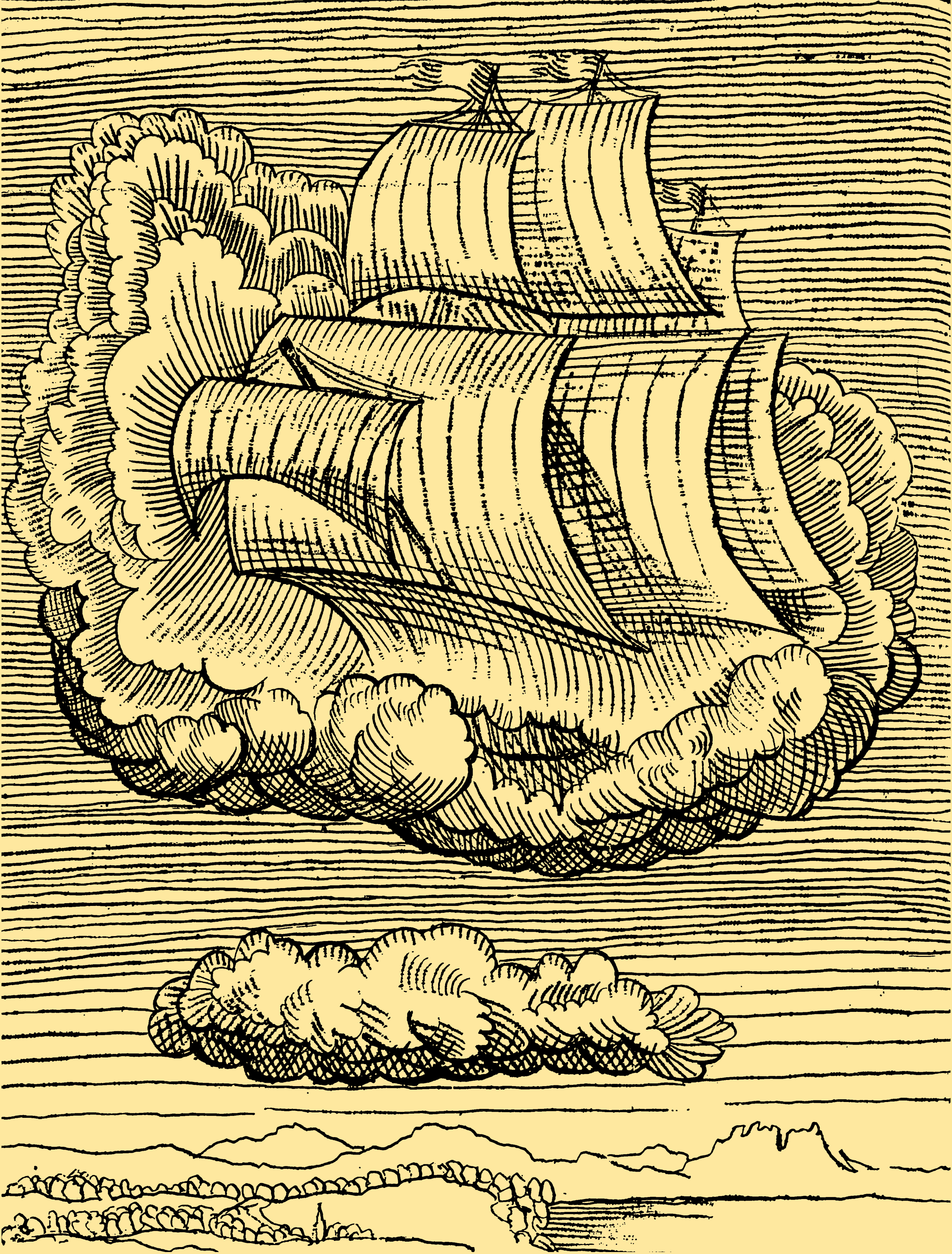
লাইয়নেল গ্রে গোঁফের ফাঁকে হাসি লুকোলেন। পুত্রের জবাবের মধ্যে নিজেকে চিনতে পেরে তাকে আর শাস্তি দিলেন না।

দুর্গ নিয়ে অক্লান্ত চর্চায় গ্রে মেতে উঠল, সে আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিসের সন্ধান পেল। যেমন, চিলেকোঠায় সে আবিষ্কার করল নাইটদের ইস্পাতের জঞ্জাল, লোহায় ও চামড়ায় বাঁধানো বইপুথি, ছিন্নভিন্ন পোশাক পরিচ্ছদ আর পায়রার ঝাঁক। যেখানে মদ রাখা হত সেই ভূগর্ভকুঠরিতে সে পেল লাফিত্, মাদেরা ও শেরি সম্পর্কে আকর্ষণীয় তথ্য। এখানে অসমকোণী ত্রিভুজের আকারবিশিষ্ট খিলান-চাপানো ছুঁচাল জানলার ঘোলা-ঘোলা আলোর মধ্যে ছিল ছোট-বড় নানান আকারের পিপে; সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় যেটা, যেটা দেখতে চেপ্টা বৃত্তের মতো, সেটা ভূগর্ভকুঠরির আড়াআড়ি গোটা দেয়াল জুড়ে ছিল — পিপের একশ' বছরের কালো ওককাঠ জেল্লা দিচ্ছিল পালিশের মতো। পিপেগুলির মাঝখানে কিছু বোনা ঝুড়ির মধ্যে ছিল সবুজ ও ফিকে নীল রঙের কাচের পেটমোটা বোতল। পাথরের ওপরে এবং মাটির মেঝেতে গজিয়েছে সরু সরু ডাঁটিওয়ালা ছাইরঙা ব্যাঙের ছাতা; সর্বত্র—ছাতা, শেওলা, সেঁতসেঁতে, টোকো-টোকো, শ্বাসরোধী গন্ধ। দূরের এক কোণে বিশাল মাকড়সার জালটার গায়ে সন্ধ্যার দিকে যখন সূর্য উঁকি মেরে শেষ কিরণের রেশ ফেলে তখন সেটাতে সোনালি রঙ ধরে। এক জায়গায় মাটির নীচে পোঁতা ছিল সেরা আলিকান্তে মদের দুটো পিপে, যেমনটি পাওয়া যেত ক্রমওয়েলের আমলে। কুঠরির ভাণ্ডারী গ্রেকে ফাঁকা কোণটা দেখিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখ করতে ভুলত না সেই বিখ্যাত কবরের ঘটনা, যে-কবরের ভেতরে শায়িত মৃতদেহটি ছিল একপাল ফক্সটেরিয়ারের চেয়েও বেশি জ্যান্ত। গল্প শুরু করার সময় লোকটা পরীক্ষা করে দেখতে ভুলত না বড় পিপের কলটা কাজ করছে কিনা। পরে ওটার কাছ থেকে সে যখন সরে আসত তখন দেখে মনে হত যেন তার মনটা হালকা হয়ে গেছে, কেননা অতিরিক্ত গাঢ় আনন্দবশত তার খুশিভরা চোখজোড়া আপনা থেকেই সজল হয়ে চিকচিক করত।

"ব্যাপারটা হল গিয়ে এই," একটা খালি বাক্সের ওপর জাঁকিয়ে বসতে বসতে, চোখা নাকের ফুটোয় নস্যি ঠাসতে ঠাসতে গ্রেকে বলে পোল্‌ডিশক, "এই জায়গাটা দেখছ ত? ওখানে আছে এমন মদ যার জন্য এমন কোন মাতাল নেই যে ঐ রকম ছোট এক গেলাস বাগানোর সুযোগ পেয়ে নিজের জিভ কেটে ফেলতে নারাজ হবে। প্রতিটি পিপেতে









 আছে একশ' লিটার করে বস্তু, যা মানুষের হৃৎপিণ্ডকে চৌচির করে দেয়, তার দেহকে পরিণত করে জড়পিণ্ডে। এ বস্তুর রঙ চেরির থেকেও গাঢ়, আর তা বোতল থেকে পড়ে না। এ হল ভালো ননীর মতো ঘন। একে বন্ধ করে রাখা হয়েছে লোহার মতো মজবুত আবলুস কাঠের পিপের মধ্যে। পিপের ওপরে আছে লাল তামার দ্বিগুণ পতর। পতরের ওপর লাতিন ভাষায় লেখা আছে:"আমাকে পান করবেন গ্রে, যখন তিনি স্বর্গে যাবেন।" এই লেখাটার অর্থ নিয়ে এত ব্যাখ্যা আর মতবিরোধ দেখা দিল যে তোমার ঠাকুর্দার বাবা, কুলীনসন্তান সিমিওন গ্রে এক বাগানবাড়ি তৈরি করে তার নাম দেন 'স্বর্গপুরী'— এই ভাবে নির্দোষ রসবোধের সাহায্যে বাস্তবের সঙ্গে হেঁয়ালিকে মেলাবেন বলে তিনি ভেবেছিলেন। কিন্তু ফল কী হল বল দেখি? যেই তিনি পতর খুলতে গেলেন অমনি মারা গেলেন হৃৎপিণ্ড ফেটে — এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন পেটুক বুড়ো মানুষটি। তার পর থেকে এই পিপেটা আর ছোঁয়া হয় না। এমন একটা বিশ্বাস সকলের হল যে মহামূল্যবান মদ দুর্ভাগ্য নিয়ে আসবে। এটা অবশ্য ঠিক যে মিশরের স্ফিংক্স এরকম হেঁয়ালি করে নি। সত্যি কথা বলতে গেলে কি, সে একজন জ্ঞানীকে জিজ্ঞেস করেছিল: "সকলকে যেমন খাই, তোমাকে তেমনি খাব কি? — সত্যি কথা বলো, তুমি বেঁচে যাবে।" কিন্তু ভালোমতো বিচারবিবেচনা করে..."

"মনে হচ্ছে আবার কল থেকে ফোঁটা পড়ছে," নিজের কথার মাঝখানে পোল্‌ডিশক নিজেই বলে উঠল এবং আঁকাবাঁকা পদক্ষেপে কোনাটার দিকে ধেয়ে গেল, কলটা বন্ধ করে সে যখন ফিরে এলো তখন তার হাঁ-করা মুখ হয়ে উঠেছে উজ্জ্বল। "হ্যাঁ। ভালোমতো বিচারবিবেচনা করে, আর বড় কথা হল ধীরেসুস্থে, জ্ঞানী লোকটা স্ফিংক্সকে বলতে পারতেন: "চল রে ভাই মদ খাওয়া যাক, তাহলেই এসব মূর্খের প্রলাপ তুমি ভুলে যাবে।" কিন্তু "আমাকে পান করবেন গ্রে, যখন তিনি স্বর্গে যাবেন!" এর অর্থ কী? যখন মারা যাবেন তখন পান করবেন — এই নাকি? অদ্ভুত ব্যাপার। এই কারণে উনি সাধুপুরুষ, এই কারণে উনি মদ পান করেন না, সাধারণ ভোদ্‌কাও পান করেন না। ধরা যাক, 'স্বর্গ' অর্থ সুখ। কিন্তু প্রশ্নটা যদি এই ভাবে রাখা যায়, সমস্ত রকমের সুখ তার অর্ধেক ঝলমলে পালকই হারিয়ে ফেলে যখন ভাগ্যবান মানুষ বেশ আন্তরিক ভাবে নিজেকে জিজ্ঞেস করে: এটা কি স্বর্গসুখ? এইখানেই ত মজা। হালকা মন নিয়ে এই রকম পিপে থেকে আকণ্ঠ পান করে হাসতে হলে, ভালো করে হাসতে হলে, বুঝলে খোকা, দরকার হল এক পা মর্ত্যে আরেক পা স্বর্গে রেখে দাঁড়ান। তৃতীয় আরও একটি ব্যাখ্যা আছে: তা হল এই যে কোন এক সময় গ্রে পান করতে করতে তুরীয় অবস্থায় উপস্থিত হবেন এবং সাহস করে পিপে উজার করবেন। কিন্তু, খোকা, এটাকে ত আর ভবিষ্যদ্বাণী ফলা বলতে পারা যায় না, সে হবে শুঁড়িখানার হল্লা।"

বড় পিপের কলটা ঠিক আছে কিনা আরও একবার পরীক্ষা করে নিশ্চিন্ত হওয়ার পর পোল্‌ডিশক ধ্যানস্থ হয়ে গম্ভীর ভাবে বলল:

"এই পিপেগুলো সতেরো শ' তেরানব্বই সালে তোমার পূর্বপুরুষ জন গ্রে 'বিগ্‌ল' জাহাজে করে লিস্‌বন থেকে নিয়ে আসেন; মদের জন্য দাম দিতে হয় দুহাজার সোনার পিয়াস্তর। পিপের ওপরকার লেখাটি খোদাই করেছে পণ্ডিচেরীর অস্ত্রকারিগর বেঞ্জামিন

এলিয়ান। পিপে পুঁতে রাখা হয়েছে মাটির ছয় ফুট নীচে, আর তার ওপর ছড়ানো আছে আঙুরলতার ছাই। এই মদ কেউ খায় নি, চেখে দেখে নি, দেখবেও না।"

"আমি ওটা খাব," গ্রে একদিন মাটিতে পা ঠুকে বলল।

"একেই বলে সাহসী যুবক!" পোল্‌ডিশক মন্তব্য করল। "তুমি কি ওটা স্বর্গে গিয়ে পান করবে?"

"আলবত্‌। এই ত স্বর্গ! স্বর্গ আমার কাছে, দেখতে পাচ্ছ?" গ্রে নিঃশব্দে হাসতে হাসতে তার ছোট্ট হাত পেতে দেখাল। তার কোমল অথচ সুগঠিত করতল সূর্যের আলোয় ঝলমল করে উঠল, বালক হাতের আঙুল গুটিয়ে মুঠো পাকাল। "এই যে এখানে! এই আছে, এই নেই!"

একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সে কখনও হাতের মুঠো খোলে, কখনও পাকায় এবং নিজের ঠাট্টায় খুশি হয়ে পোল্‌ডিশককে পিছে ফেলে অন্ধকার সিঁড়ি বয়ে দৌড়ে নেমে গেল নীচের তলার করিডরে।

রান্নাঘরে যাবার ব্যাপারে গ্রের ওপর কড়া বিধিনিষেধ ছিল। কিন্তু উনুনের লেলিহান শিখার দীপ্তি, ভাপ আর ধোঁয়ার কালি, ফুটন্ত তরল পদার্থের টগবগ আর শোঁ-শোঁ আওয়াজ, ছুরির ঠকাঠক আর রুচিকর ঘ্রাণের বিস্ময়কর জগতের সন্ধান একবার পাবার পর বালক সোৎসাহে এই বিশাল ঘরটাতে এসে হানা দিত। ধর্মযাজকদের মতো কঠিন নীরবতা বজায় রেখে ঘোরাফেরা করত পাচকের দল; কালিপড়া দেয়ালের পটভূমিকায় তাদের মাথার সাদা টুপি কাজে সঞ্চার করত ধর্মোপাসনার আনুষ্ঠানিক চরিত্র; ফুর্তিবাজ, মোটাসোটা গড়নের বাঁসন-মাজা চাকরানীরা পিপেভর্তি জলের সামনে দাঁড়িয়ে চীনেমাটি আর রুপোর ঝনঝন আওয়াজ তুলে বাসন মাজত; ছোকরা চাকরেরা মাছ, ঝিনুক, গুগলি আর ফলপাকড়ে ভর্তি ঝুড়ি বয়ে আনতে গিয়ে ভারে নুয়ে পড়ত। সেখানে লম্বা টেবিলের ওপর পড়ে থাকত রামধনু রঙের ফেজাণ্ট, ছাইরঙা হাঁস, বিচিত্রবর্ণের মুরগী; থাকত শিশুর ভঙ্গিতে দুই চোখ বোজা, বেঁড়ে লেজওয়ালা শুয়োরের ধড়; থাকত শালগম, বাঁধাকপি, বাদাম, নীলরঙের কিসমিস আর রোদে পোড়া পীচফল।

রান্নাঘরে গ্রের খানিকটা ভয়-ভয় লাগত: তার মনে হত এখানে সকলকে চালাচ্ছে যেন কোন অশুভ শক্তি, যেই শক্তির হাতে আছে দুর্গের জীবনের মূল চাবিকাঠি। চিৎকার-চেঁচামেচিকে শোনাত নির্দেশ ও মন্ত্রোচ্চারণের মতো; দীর্ঘকালের অভ্যাসবশত কর্মরত লোকজনের গতিবিধি হয়ে দাঁড়িয়েছে এমন সুস্পষ্ট, পরিমিত ও নির্ভুল, যাকে দেখলে মনে হয় প্রেরণা। সবচেয়ে বড় কড়াটা থেকে ভিসুভিয়াসের মতো টগবগ আওয়াজ উঠত। গ্রে এতটা লম্বা ছিল না যাতে ওটার ভেতরে উঁকি মারতে পারে, কিন্তু তার প্রতি সে অনুভব করত এক বিশেষ সম্ভ্রম; দুজন চাকরানী মিলে যখন কড়াটাকে নাড়াচাড়া করত, তা দেখে সে শিহরিত হত। তখন উনুনের ওপরে ছিটকে উঠত ধোঁয়ায় ভরা ফেনা আর ভাপ, গর্জনরত উনুন থেকে ঢেউয়ের আকারে উঠে তা ভরপুর করে দিত রান্নাঘরকে। একবার তরল পদার্থ এত বেশি পরিমাণ ছিটকে ওঠে যে তাতে একটা মেয়ের হাতে ছ্যাঁকা লেগে যায়। চামড়া সঙ্গে সঙ্গে লাল হয়ে ওঠে,

 এমনকি রক্তপ্রবাহের ফলে নখও লাল টকটকে হয়ে যায়। তখন বেট্সী (চাকরানীটার নাম) কাঁদতে কাঁদতে ক্ষতস্থানে তেল মালিশ করতে থাকে। সে আর চোখের জল চেপে রাখতে পারে না। তার গোলাকার, ভয়ার্ত মুখের ওপর দিয়ে দরদর ধারে ঝরে পড়তে থাকে চোখের জল।

গ্রে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। অন্যান্য মেয়েরা যখন বেট্সীকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সেই সময় গ্রে অন্যের তীব্র বেদনার জন্য মনে মনে কষ্ট অনুভব করছিল বটে, কিন্তু সে-বেদনার অভিজ্ঞতা তার নিজের তখনও হয় নি।

"তোমার কি খুব ব্যথা লাগছে?" গ্রে জিজ্ঞেস করল।

"একবার দেখই না কেমন, টের পাবে," এপ্রন দিয়ে হাত ঢাকতে ঢাকতে বেট্সী জবাব দিল।

ভুরু কুঁচকে বালক টুলের ওপর চড়ে লম্বা হাতা দিয়ে গরম ঝোল (প্রসঙ্গত বলতে হয় সেটা ছিল ভেড়ার মাংসের সুপ) তুলে নিয়ে নিজের হাতের কবজির ভাঁজের ওপর ঢেলে দিল। দেখা গেল অনুভূতিটা দুর্বল গোছের নয়, কিন্তু প্রচণ্ড ব্যথার দরুন দৌর্বল্যবশত সে সামান্য টাল না খেয়ে পারল না। ময়দার মতো ফেকাশে হয়ে গ্রে ঝলসানো হাত প্যান্টের পকেটে পুরে বেট্সীর সামনে এগিয়ে এল।

"আমার মনে হচ্ছে তোমার খুবই ব্যথা লেগেছে," নিজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য না করে সে বলল। "চল বেট্সী, ডাক্তারের কাছে চল। চল না!"

টোটকার পক্ষপাতী লোকজন যখন একে অন্যের ওপর টেক্কা দিয়ে চাকরানীকে নানা রকম ব্যবস্থাপত্র দিতে ব্যস্ত সেই সময় গ্রে তার কাপড়ের আঁচল ধরে টানতে টানতে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। মেয়েটি ব্যথায় এত কষ্ট পাচ্ছিল যে সে গ্রের সঙ্গে চলল। ডাক্তার ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতে যন্ত্রণা খানিকটা কমল। বেট্সী চলে যাবার আগে বালক নিজের হাত দেখাল না।

এই অকিঞ্চিৎকর ঘটনাটির ফলে বিশ বছরের বেট্সী ও দশ বছরের গ্রের মধ্যে খাঁটি বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। বেট্সী ওর পকেটে গাদা গাদা পিঠে আর আপেল পুরে দিত, গ্রে বেট্সীকে বলত নিজের বইয়ে পড়া রূপকথা এবং আরও নানা কাহিনী। একদিন গ্রে জানতে পারল যে বেট্সী সহিস জিমকে বিয়ে করতে পারছে না, যেহেতু গৃহস্থালি পাতার মতো টাকাকড়ি তাদের নেই। গ্রে চুল্লি খোঁচানোর চিমটের বাড়ি দিয়ে নিজের চীনেমাটির পয়সা জমানোর ঘট ভেঙে সেখান থেকে ঝেড়ে বার করল সমস্ত পয়সা — প্রায় একশ' পাউন্ড। সকাল-সকাল উঠে, যৌতুকহীনা যখন রান্নাঘরে চলে গেছে, তখন তার ঘরে ঢুকে মেয়েটির সিন্দুকের ভেতরে উপহার গুঁজে দিয়ে গ্রে ওপরে লিখে রাখল একটা সংক্ষিপ্ত চিরকুট: "বেট্সী, এটা তোমার। রবিন হুড, দস্যুদলের সর্দার।" এই ঘটনায় রান্নাঘরে যে হুলস্থূল পড়ে গেল তা এমন আকার নিল যে গ্রেকে কারচুপির কথা স্বীকার করতে হল। সে টাকা ফেরত নিল না এবং টাকা-পয়সা সম্পর্কে আর কিছু বলতেও চাইল না।

তার মা ছিলেন এমন স্বভাবের নারী, জীবন যাদের ঢালাই করে দেয় ধরা বাঁধা ছাঁচে। সাদাসিধে মনের যা যা বাসনা হতে পারে সেগুলি পূরণের নিশ্চয়তা থাকায়

তিনি বাস করতেন জাগরস্বপ্নের মধ্যে; এই কারণে দরজি, ডাক্তার আর বাটলারের সঙ্গে পরামর্শ করা ছাড়া তাঁর আর কিছুই করার ছিল না। কিন্তু শিক্ষাদীক্ষা ও ভাগ্যের ক্লোরফর্ম প্রয়োগে তাঁর যে-সমস্ত প্রবণতা ইতিমধ্যেই ইচ্ছাশক্তিহীন হয়ে, জীবনীশক্তি হারিয়ে ভাসা ভাসা ভুড়ভুড়ি কাটছে, সেগুলির মধ্যে মনে হয় একমাত্র উল্লেখযোগ্য শক্তি ছিল নিজের 'অদ্ভুত' শিশুটির প্রতি তাঁর প্রবল অনুরাগ, যাকে অনেকটা ধর্মীয় পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে। অভিজাত মহিলাটিকে দেখে মনে হত ময়ূরী যেন রাজহাঁসের ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা বার করেছে। পুত্রের অপূর্ব বিশিষ্টতায় তিনি মর্মপীড়া অনুভব করতেন: বালককে যখন তিনি বুকে চেপে ধরতেন তখন বিষণ্ণতা, স্নেহ আর সঙ্কোচে তিনি আচ্ছন্ন হয়ে পড়তেন; সম্পর্ক ও মনোভাব প্রকাশের অভ্যস্ত রূপে ভাষায় সচরাচর যা প্রকাশ পায়, তাঁর মন সে কথা বলত না। এই ভাবে গতানুগতিক দালানের মাপাজোখা পরিবেশের মধ্যে এসে প্রবেশ করে সূর্যকিরণের খেয়ালি কল্পনারচিত মেঘলা ভাব। মহিলার মামুলী সদ্‌গুণগুলি নষ্ট হয়; চোখ দেখতে পায়, কিন্তু দেখেও বাড়ি চিনতে পারে না; রিক্ততার মাঝখানে রহস্যময় আলো গড়ে তোলে চোখ-ধাঁধানো সামঞ্জস্য।

যাঁর মুখাবয়ব আর দেহের গঠন দেখে মনে হতে পারত জীবনের অগ্নিগর্ভ আহ্বানের উত্তরে একমাত্র বরফকঠিন নীরবতাই অবলম্বন করে থাকতে পারেন, যাঁর সূক্ষ্ম সৌন্দর্য আকর্ষণের চেয়ে সম্ভবত বিকর্ষণই বেশি ঘটাত, যেহেতু তাঁর মধ্যে অনুভব করা যেত নারীসুলভ আকর্ষণবঞ্চিত স্পর্ধিত ইচ্ছাশক্তির প্রবল প্রকাশ, সেই অভিজাত মহিলা লিলিয়ান গ্রে তাঁর ছেলের সঙ্গে যখন একান্তে থাকতেন তখন হয়ে যেতেন সাধারণ মা, তিনি সস্নেহে, নম্র স্বরে বলতেন হৃদয় থেকে উৎসারিত সেই সমস্ত তুচ্ছ বিষয় যা কাগজে কলমে প্রকাশ করা যায় না; সেগুলির শক্তি তাদের নিজেদের মধ্যে নয়, অনুভূতির মধ্যে। পুত্রকে তিনি কোন ব্যাপারেই সম্পূর্ণ বিমুখ করতে পারতেন না। পুত্রের রান্নাঘরে যাওয়া, পাঠের প্রতি বিতৃষ্ণা, অবাধ্যতা এবং অসংখ্য আবদার — তার সব কিছুই তিনি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখতেন।

তার যদি ইচ্ছে হত যে গাছের ডালপালা ছাঁটা চলবে না তাহলে গাছ স্পর্শ করা হত না; সে যদি কারও পক্ষ নিয়ে ক্ষমা করার বা পুরস্কার দানের অনুরোধ জানাত তাহলে যার জন্য এটা করা হচ্ছে সে জানত যে তা-ই হবে; সে যে-কোন ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে পারত, যে কোন কুকুরকে দুর্গে আনতে পারত; ইচ্ছেমতো লাইব্রেরীতে বইপুথি ঘাঁটাঘাঁটি করতে পারত, খালি পায়ে ছুটোছুটি করতে পারত, যা তার খেয়াল হত তা-ই খেতে পারত।

তার বাবা কিছু কাল এর বিরুদ্ধে যুঝতে গিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে পিছিয়ে আসতে হয় — নীতিগত ভাবে নয়, স্ত্রীর ইচ্ছায়। তাঁকে তুষ্ট থাকতে হয় দুর্গ থেকে সমস্ত ছোকরা চাকরকে বিতাড়ন করে, যেহেতু তাঁর আশঙ্কা ছিল যে নিম্নবর্গের লোকজনের সঙ্গে মেলামেশার কল্যাণে বালকের খেয়াল এমন প্রবণতায় পরিণত হতে পারে যা নির্মূল করা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে। মোটের উপর তিনি সম্পূর্ণভাবে ডুবে থাকতেন অসংখ্য পারিবারিক মামলামোকদ্দমা নিয়ে, যেগুলির শুরু

 হারিয়ে গেছে কাগজের কারখানা সূত্রপাতের যুগে আর শেষ গিয়ে ঠেকছে যাবতীয় চক্রান্তকারীর মৃত্যুতে। তাছাড়া সরকারী কাজ, ভূসম্পত্তি দেখাশোনার কাজ, স্মৃতিকথার শ্রুতিলিখন দেওয়া, আনুষ্ঠানিক শিকার-যাত্রা, পত্রপত্রিকা পাঠ এবং জটিল চিঠিপত্র লেখালেখি নিয়ে ব্যস্ত থাকার ফলে পরিবার থেকে নিজেকে বেশ খানিকটা ভেতরে গুটিয়ে নিয়ে তাঁকে আলাদা হয়ে থাকতে হত; পুত্রের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ এত কদাচিৎ হত যে কখনও কখনও তিনি ভুলেই যেতেন ছেলেটার বয়স কত।

এই ভাবে, গ্রে বাস করতে লাগল তার নিজস্ব জগতে। সে খেলা করত একা একা — সচরাচর দুর্গের পেছনের উঠোনে, যে জায়গাটা পুরানো আমলে ছিল সামরিক তাৎপর্যপূর্ণ। উঁচু উঁচু গড়খাইয়ের ধ্বংসাবশেষ আর শেওলা ধরা পাথরের ভূগর্ভকুঠরি সমেত এই বিস্তৃত ফাঁকা জায়গাটা ছিল লম্বা লম্বা আগাছা, বিছুটি, ভাঁটুইগাছ, কাঁটাগাছ আর বিচিত্র বর্ণের সাদাসিধে বুনো ফুলে ভর্তি। গ্রে এখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিত — সে ছুঁচোদের গর্ত নিরীক্ষণ করত, লম্বা লম্বা আগাছাদের সঙ্গে যুদ্ধ করত, প্রজাপতিদের জন্য ওত্ পেতে থাকত, ভাঙা ইট দিয়ে কেল্লা বানিয়ে পথ বাঁধানোর পাথর আর লাঠি দিয়ে তার উপর বোমা বর্ষণ করত।

সে যখন এগারো পেরোল তখন তার স্বভাবের সমস্ত লক্ষণ, তার অন্তরাত্মার পৃথক পৃথক সমস্ত বৈশিষ্ট্য এবং গোপন আবেগের আভাসগুলি এক তীব্র ক্ষণে এসে মিলিত হল আর এই ভাবে সুগঠিত অভিব্যক্তি লাভ করে হয়ে দাঁড়াল অদম্য বাসনা। এর আগে পর্যন্ত সে যা খুঁজে পাচ্ছিল তা হল অন্য অসংখ্য বাগিচার মধ্যে তার নিজের বাগিচার পৃথক পৃথক অংশ মাত্র — আলোর ঝলক, ছায়া, ফুল, গাছের নিবিড় ও জমকাল কান্ড; এখন হঠাৎ তাদের দেখতে পেল স্পষ্ট, দেখতে পেল সমস্তটা — এক অপূর্ব, বিস্ময়কর সঙ্গতি নিয়ে।

ঘটনাটা ঘটে লাইব্রেরীতে। মাথার ওপরে ঘষা কাচ লাগানো উঁচু দরজার আগল সচরাচর বন্ধ থাকত, কিন্তু ভাঁজ করা পাল্লার মাঝখানে কোটরের ভেতরে ছিটকিনি ভালোভাবে আটকাত না; হাত দিয়ে একটু চাপ দিলেই দরজা ফাঁক হয়ে যেত, জোরে ধাক্কা দিলে পাল্লা খুলে যেত। আবিষ্কারের প্রেরণাবশত গ্রেকে যখন লাইব্রেরীতে প্রবেশ করতে হল তখন সে অবাক হয়ে গেল ধুলোটে আলো দেখে, যার সমস্ত শক্তি ও বৈশিষ্ট্য নিহিত ছিল জানলার কাচের উপরের অংশের রঙিন নক্সার মধ্যে। বদ্ধ জলাশয়ের মতো এখানে ছিল একটা পড়ো থমথমে ভাব। বইয়ের আলমারির অন্ধকারাচ্ছন্ন সারি জায়গায় জায়গায় জানলার গায়ে ঠেকে গিয়ে জানলাকে অর্ধেক আড়াল করে দিয়েছে; আলমারির ফাঁকে ফাঁকে যাতায়াতের পথগুলি বইয়ের গাদায় বোঝাই। সেখানে ছিল খোলা এলবাম, যেগুলির ভেতরের পাতা বাইরে বেরিয়ে আসছে; ছিল সোনালি ফিতেয় বাঁধা গোটান পুঁথি; ভয়ংকর চেহারার বইপুঁথির স্তূপ; পান্ডুলিপির মোটা মোটা স্তর, খুদে সংস্করণের বইয়ের গাদা, যেগুলিকে খুলতে গেলে ছালের মতো চড়চড় করে; ছিল নক্সা আর নানা রকমের তালিকা, সারি সারি নতুন নতুন সংস্করণ, মানচিত্র; এবড়োখেবড়ো, কোমল, কালো, বিচিত্র বর্ণের, নীল, ছাইরঙা, মোটা, সরু, খসখসে, মসৃণ — কত রকমেরই না বাঁধাই। আলমারিগুলি ছিল আগাগোড়া বইয়ে ঠাসা। সেগুলিকে

দেখে মনে হত যেন দেয়াল, আর তাদের ঘনত্বের ঠিক মাঝখানে যেন বন্দী হয়ে আছে জীবন। আলমারির কাচের প্রতিফলনের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হত বর্ণহীন চকচকে দাগ-ধরা অন্যান্য আলমারি। তামার তৈরি মণ্ডলাকার বিষুবরেখা ও মধ্যরেখার ক্রসে বন্দী হয়ে গোল টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল একটা বিশাল ভূগোলক।

বেরোবার পথের দিকে ফিরে তাকাতে দরজার ওপরে যে বিরাট ছবিটি গ্রে দেখতে পেল তার বিষয়বস্তু যেন সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করছে লাইব্রেরীর গুমোট আড়ষ্ট পরিবেশ। ছবিটিতে আঁকা ছিল সমুদ্রের তরঙ্গশীর্ষে উত্থিত একটি জাহাজ। তরঙ্গের গা বয়ে গড়িয়ে পড়ছে ফেনার ধারা। জাহাজ আঁকা হয়েছে ওঠার চরম মুহূর্তে। জাহাজটি চলেছে সোজা দর্শকের দিকে। বোস্প্রিট অনেক উঁচুতে উঠে মাস্তুলের ভিতকে আড়াল করে রেখেছে। জাহাজের তলদেশের ঘায়ে দ্বিধাবিভক্ত তরঙ্গশীর্ষকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন বিশাল এক পাখির দুটি ডানা। ফেনা ছিটকে পড়ছে আকাশে। জাহাজের পুরোভাগের আড়াল থেকে অস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর এবং বোস্প্রিটের উপরে উঁচিয়ে থাকা পালগুলি ঝড়ের প্রচণ্ড শক্তিতে ফুলে ফেঁপে উঠে গোটা আয়তন নিয়ে হেলে পড়েছে পেছনের দিকে — উদ্দেশ্য হল তরঙ্গটা পেরিয়েই সোজা হয়ে দাঁড়ানো, তারপর অতল গহ্বরের ওপর ঝুঁকে পড়ে জাহাজকে তীব্র বেগে চালিয়ে দেওয়া নতুন নতুন তরঙ্গরাশির দিকে। সাগরের ওপর নীচু হয়ে কাঁপছিল ছেঁড়া মেঘের খণ্ড। রাতের আঁধার ঘনিয়ে আসছিল, তার বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে যুঝে চলছিল নিষ্প্রভ আলো। কিন্তু এই ছবিতে সবচেয়ে লক্ষ করার মতো ছিল দর্শকের দিকে পেছন ফিরে জাহাজের পুরোভাগে দণ্ডায়মান এক মনুষ্যমূর্তি। মূর্তিটিতে প্রকাশ পাচ্ছিল সমগ্র পরিস্থিতি, এমন কি ঐ মুহূর্তের বিশেষ চরিত্র। মানুষটির অঙ্গভঙ্গি (সে দুই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে দু হাত নাড়াচ্ছিল) থেকে বস্তুত সে যে কী কাজ করছিল তা বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু তা থেকে আন্দাজ করা যাচ্ছিল অদৃশ্য দর্শকের উদ্দেশ্যে ডেকের কোন একটা কিছুর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য দারুণ প্রয়াস সে করছে। তার ঢিলে জামার গোটানো প্রান্তদেশ বাতাসে কাঁপছিল; সাদা চুলের গোছা আর কালো তরবারি টানটান হয়ে বাতাসে উড়ছে; পোশাকের ঐশ্বর্য থেকে বোঝা যাচ্ছিল লোকটা হল ক্যাপ্টেন, আর তার নৃত্যরত দেহভঙ্গিতে প্রকাশ পাচ্ছিল তরঙ্গের বিস্তার; মাথায় তার টুপি নেই, সম্ভবত বিপজ্জনক মুহূর্তে তার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, সে চিৎকার করছে — কিন্তু ব্যাপারটা কী? জাহাজ থেকে কোন লোক পড়ে যাবার ঘটনা কি তার চোখে পড়েছে? সে কি জাহাজের গতি পরিবর্তনের নির্দেশ দিচ্ছে, নাকি বাতাসের আওয়াজ ছাপিয়ে সারেঙ্গকে ডাকছে? ভাবনা নয়, এই সমস্ত ভাবনার ছায়া গ্রের মনে উদয় হল যখন সে ছবিটা দেখছিল। হঠাৎ তার মনে হল যেন বাঁ দিক থেকে অচেনা, অদৃশ্য কেউ এগিয়ে এসে পাশে দাঁড়াল; মাথাটা ঘোরালেই এই খেয়ালি কল্পনাবিজড়িত উপলব্ধিটি অদৃশ্য হয়ে যায়, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। গ্রে তা জানত। কিন্তু সে তার কল্পনাকে নিভতে দিল না, বরং কান পেতে শুনল। নিঃশব্দ কণ্ঠস্বর মালয়ী ভাষার মতো দুর্বোধ্য ভাঙা ভাঙা কয়েকটি বাক্যাংশ উচ্চারণ করল; একটানা ধ্বসের আওয়াজের মতো আওয়াজ উঠল; লাইব্রেরী পূর্ণ হয়ে উঠল প্রতিধ্বনিতে আর বিষণ্ণ বাতাসে। এ সবই গ্রে শুনতে

 পেল নিজের মনের ভেতরে। মুহূর্তের মধ্যে বিরাজমান নিস্তব্ধতা কল্পনার ঝঙ্কৃত জাল ছিন্নভিন্ন করে দিল; ঝড়ের সঙ্গে যোগসূত্র মিলিয়ে গেল।

গ্রে কয়েকবার এই ছবিটি দেখতে আসে। ছবিটি তার কাছে হয়ে দাঁড়ায় জীবনের সঙ্গে আত্মার কথোপকথনের সেই প্রয়োজনীয় শব্দ, যাকে বাদ দিয়ে নিজেকে হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। ছোট বালকের মধ্যে উপরে উপরে গেঁথে বসে বিশাল সমুদ্র। সমুদ্রের সঙ্গে তার সখ্য গড়ে ওঠে, লাইব্রেরীতে সে ঘাঁটাঘাঁটি করে, খুঁজে বেড়ায় এবং পড়ে চলে এমন সব বই যাদের সোনালি দ্বারের ওপারে উন্মুক্ত হয় গভীর নীল রঙের সাগর-মহাসাগর, সেখানে পেছন দিকে ফেনা ছড়াতে ছড়াতে এগিয়ে চলে জাহাজ। কোন কোন জাহাজের পাল আর মাস্তুল খোয়া যায়, তরঙ্গের আঘাতে বিষম খেয়ে তারা নামতে থাকে অতল অন্ধকার গর্ভে, যেখানে ঝলক দেয় মাছের ফসফরাস-চোখ। কিছু কিছু জাহাজ তরঙ্গভঙ্গের কবলে পড়ে জলগর্ভের শৈলপ্রাচীরের গায়ে ঘা খায়; প্রশমিত তরঙ্গ জাহাজের খোলকে ভয়ঙ্কর ভাবে নাড়াতে থাকে; দড়িদড়া-ছেঁড়া, জনমানবপরিত্যক্ত এক জাহাজ দীর্ঘ যন্ত্রণা ভোগ করে, শেষ কালে নতুন এক দমকা ঝড়ে টুকরো টুকরো হয়ে ভেসে যায়। আবার কোন কোন জাহাজ নিরাপদে কোন এক বন্দরে মাল বোঝাই করছে, অন্য এক বন্দরে খালাস করছে; খালাসীরা সরাইখানায় টেবিলের ধারে বসে সমুদ্রযাত্রার কীর্তিকাহিনী বলছে, মৌজ করে ভোদ্‌কা পান করছে। এছাড়াও ছিল জলদস্যুদের জাহাজ -- সেখানে উড়ত কালো পতাকা, আর দস্যুদল নাড়ত ভয়ঙ্কর ছুরিছোরা; ছিল নিষ্প্রাণ নীল-নীল আলোর আভায় উজ্জ্বল ভুতুড়ে জাহাজ; সৈন্যসামন্ত, কামান আর গানবাজনা সমেত যুদ্ধজাহাজ; আগ্নেয়গিরি, গাছপালা আর জীবজন্তু নিয়ে অনুসন্ধানরত বৈজ্ঞানিক অভিযানের জাহাজ; থমথমে রহস্যে আচ্ছন্ন আর বিদ্রোহ-বিক্ষুব্ধ জাহাজ; আবিষ্কারের জাহাজ, অ্যাডভেঞ্চারের জাহাজ।

এই জগতে, স্বাভাবিক কারণেই সবার চেয়ে ওপরে ছিল ক্যাপ্টেনের ভাবমূর্তি। তিনি ছিলেন জাহাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, প্রাণকেন্দ্র ও বুদ্ধিবিবেচনা। তাঁর চরিত্র নির্ধারণ করত দলের অবকাশযাপন ও কাজের প্রকৃতি। খোদ দলটিকেও বেছে নিতেন ক্যাপ্টেন নিজে এবং দল অনেকাংশে তাঁর অভিরুচি অনুযায়ী চলত। তিনি প্রতিটি লোকের অভ্যাস ও পারিবারিক ব্যাপার-স্যাপার জানতেন। অধস্তনদের চোখে তিনি ঐন্দ্রজালিক জ্ঞানের আধার, আর তাঁর এই জ্ঞানের কল্যাণেই, দৃষ্টান্তস্বরূপ লিস্‌বন থেকে সাংহাইয়ে, অনন্ত জলরাশির বুকের ওপর দিয়ে নির্ভয়ে জাহাজ চলে। কষ্টসাধ্য জটিল ব্যবস্থা গ্রহণ করে তিনি ঝড়ের বিরুদ্ধে যুঝে চলেন, সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দিয়ে আতঙ্কের অবসান ঘটান; যেখানে খুশি সেখানে জাহাজ ভাসিয়ে দেন, থামান; জাহাজ ছাড়ার ও মাল বোঝাই করার, মেরামতের ও বিশ্রামের হুকুম দেন; অবিরাম গতিতে পরিপূর্ণ প্রাণচঞ্চল কাজের উপর প্রখর বুদ্ধিবিবেচনাসম্পন্ন, বিপুল ক্ষমতার কথা কল্পনায় আনা কঠিন ছিল। স্বয়ংসম্পূর্ণ ও চরম এই ক্ষমতা ছিল অর্ফিয়ুসের ক্ষমতার সমান।

আবেগবহুল ঘটনার দরুন ক্যাপ্টেন সম্পর্কে এই রকম ধারণা, তাঁর অবস্থানের এহেন আদর্শ রূপ ও খাঁটি বাস্তব চিত্র গ্রের চেতনায় উজ্জ্বল হয়ে অধিকার করে থাকে। এই জীবিকা ছাড়া আর কোন জীবিকা প্রতিটি পৃথক পৃথক সুখের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপকে

পুরোপুরি বজায় রাখার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সমস্ত ধনকে মিলিয়ে মিশিয়ে অখণ্ড রূপদানে এতটা কৃতকার্য হতে পারে না। বিপদ, ঝুঁকি, প্রকৃতির কর্তৃত্ব, দূর দেশের আলোকের ইশারা, অপরূপ অপরিচিতি, সাক্ষাৎকার ও বিচ্ছেদের মধ্যে বিকশিত, ক্ষণিকের ভালোবাসা; লোকজন, দেখাসাক্ষাৎ ও ঘটনার চিত্তাকর্ষক আলোড়ন; ঊর্ধ্ব আকাশে কখনও দক্ষিণের তারামণ্ডল, কখনও বা সপ্তর্ষিমণ্ডল আর তারই মাঝখানে জীবনের অপরিসীম বৈচিত্র্য, সন্ধানী চোখের সামনে একের পর এক মহাদেশের দৃশ্য, যদিও তোমার কেবিনের ভেতরে পুরোপুরি আছে তোমার অভিন্নহৃদয় জন্মভূমি, তার বইপুঁথি, ছবি, চিঠিপত্র, আর তোমার কঠিন বুকের ওপর হরিণের চামড়ার পুটে বন্দী হয়ে আছে প্রিয়জনের রেশমী অলকগুচ্ছে জড়ানো শুকনো ফুল।

শরৎকালে, আর্থার গ্রে যখন ষোল বছরে পড়ল, তখন গোপনে গৃহত্যাগ করে সে সমুদ্রের স্বর্ণতোরণের ওপারে প্রবেশ করল। জাহাজের শিক্ষানবিস খালাসির হাত দুটো ছিল ছোট, আর তাকে দেখে মনে হত যেন কোন এক মেয়েকে জাহাজীর বেশ পরানো হয়েছে। তাকে নিয়ে জোড়া মাস্তুলওয়ালা জাহাজ 'আন্সেল্ম' দেখতে দেখতে দুবেল্ট বন্দর থেকে যাত্রা করল মার্সাইয়ের দিকে। এই শিক্ষানবিস খালাসিটি ছিল গ্রে। তার সম্বল তখন ছিল চমৎকার একটা হাতব্যাগ, দস্তানার মতো পাতলা, চকচকে বুটজুতো আর মুকুটের ছাপ বোনা সাদা কেম্ব্রিকের জামাকাপড়।

এক বছরের মধ্যে, 'আন্সেল্ম' যতদিনে ফ্রান্স, আমেরিকা ও স্পেন ঘুরল, ততদিনে গ্রে অতীতের প্রতি ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ মিঠাই-মণ্ডা খেয়ে তার সম্পত্তির একটা অংশ উড়িয়ে দিল, আর বাকি অংশ বর্তমান ও ভবিষ্যতের খাতিরে ওড়াল তাস খেলে। তার সাধ ছিল 'পাঁড়' জাহাজী হয়। সে হাঁকপাঁক করতে করতে ভোদ্কা পান করে, স্নান করার সময় হৃৎপিণ্ড আড়ষ্ট হয়ে গেলেও মাথা নীচের দিকে করে বারো ফুট উঁচু থেকে জলে ঝাঁপ দেয়। অল্প অল্প করে প্রধান জিনিসটি ছাড়া — নিজের অদ্ভুত আবেগপ্রবণ অন্তর ছাড়া আর সব কিছুই তার গেল; তার দুর্বলতা গেল, তার হাড় চওড়া হল, পেশী মজবুত হল, ফেকাসে ভাবের বদলে দেখা দিল রোদেপোড়া তামাটে আভা, চলাফেরার মার্জিত নিশ্চিন্ততাকে জলাঞ্জলি দিয়ে সে পেল কর্মঠ হাতের দৃঢ় লক্ষ্যনিষ্ঠা, আর তার ভাবপ্রবণ চোখে প্রতিফলিত হল আগুনের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ মানুষের চোখের দীপ্তি। তার বাচনভঙ্গি অসমান, আত্মতৃপ্তিমূলক সলজ্জ তারল্য হারিয়ে হয়ে দাঁড়াল ছটফটে রুপোলি মাছের উদ্দেশ্যে জলস্রোতে শঙ্খচিলের ছোঁর মতো সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ।

'আন্সেল্ম'-এর ক্যাপ্টেন সদাশয় লোক হলেও দুর্ধর্ষ নাবিক ছিলেন। তিনি বালককে গ্রহণ করলেন অনেকটা হিংস্র উল্লাসের সঙ্গে। গ্রে'র মরিয়া আকাঙ্ক্ষার মধ্যে উদ্ভট খেয়াল ছাড়া আর কিছুই তাঁর চোখে পড়ে নি, এবং আগে থাকতেই তিনি বিজয়গর্ব বোধ করলেন এই ভেবে যে মাস দুয়েক বাদে গ্রে তাঁর দিকে মুখ তুলে না তাকিয়ে তাঁকে বলবে: "ক্যাপ্টেন হোপ, দড়িদড়া বয়ে উঠতে গিয়ে আমার কনুই ছড়ে গেছে, আমার পাঁজর আর পিঠ ব্যথা করছে, আঙুল সোজা করতে পারছি না, মাথা টিপটিপ করছে, পা কাঁপছে। এই সমস্ত ভিজে কাছি হাতের ওজনে আশি পাউণ্ড হবে; এই সব হ্যাণ্ডরেল, মাস্তুলের মাথায় বাঁধার দড়ি, নঙ্গরের দড়ি, মোটা তার, ওপরের মাস্তুল, মাস্তুলের আড়কাঠ

 সৃষ্টি হয়েছে আমার কোমল শরীরে যন্ত্রণা দেবার জন্যে। আমি মার কাছে যেতে চাই।" মনে মনে এই রকম ঘোষণা শোনার পর ক্যাপ্টেন হোপ মনে মনেই রচনা করলেন নিম্নলিখিত উক্তিটি: "যাও হে দুধের বাছা, যেখানে খুশি যাও। তোমার কোমল ডানায় যদি আলকাতরা লেগে থাকে তাহলে বাড়ি গিয়ে ধুয়ে ফেলতে পার 'রোজা-মিমোজা' ওডিকোলন দিয়ে।" এই স্বকপোলকল্পিত ওডিকোলন ক্যাপ্টেনকে সবচেয়ে বেশি খুশি করে তোলে এবং কল্পিত ভর্ৎসনার উপসংহারে তিনি সরবে বলেন "হ্যাঁ হ্যাঁ, যাও, যেখানে আছে তোমার ঐ 'রোজা-মিমোজা'।"

ইতিমধ্যে জমকাল সংলাপটি ক্যাপ্টেনের মাথায় ক্রমেই কদাচিৎ এবং আরও কদাচিৎ আসতে থাকে, কেননা গ্রে দাঁতে দাঁত চেপে, পাণ্ডুর মুখ নিয়ে লক্ষ্যের দিকে এগোতে থাকে। ভয়ঙ্কর জাহাজ যত তার দেহব্যবস্থার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে থাকে, যতই অপটুতার স্থান নিতে থাকে অভ্যাস, ততই সব কিছু তার কাছে সহজ থেকে সহজতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে অনুভব করে সে দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে নিদারুণ শ্রমের ভার সহ্য করে চলে। এমন ঘটনাও ঘটে যে নঙ্গরের শিকলের ফাঁসে সে ধাক্কা খেয়ে ডেকে পড়ে যায়, ডেকের খুঁটির আলগা তার হাত থেকে ফসকে গিয়ে তালুর চামড়া ছড়ে যায়, পালের যে ভিজে প্রান্তের গায়ে লোহার আংটা লাগানো আছে বাতাসে তার ঝাপটা এসে মুখে আঘাত করে, সংক্ষেপে বলতে গেলে গোটা কাজটাই হল এক অগ্নিপরীক্ষা, যার জন্য প্রয়োজন অখণ্ড মনোযোগ, কিন্তু পরিশ্রমে পিঠ নুইয়ে নিশ্বাস নিতে তার যত কষ্টই হোক না কেন মুখে তার সব সময় লেগে থাকত অবজ্ঞার হাসি। সে নীরবে সহ্য করে যায় ঠাট্টা-বিদ্রূপ, উপহাস আর অনিবার্য গালিগালাজ, যত দিন না নতুন ক্ষেত্রে সে 'আপনজনে' পরিণত হল, কিন্তু সেই মুহূর্ত থেকে যে-কোন অপমানের জবাবে সে চালিয়ে দিত বক্সিং।

এক দিন তাকে মাস্তুলের আগায় নিপুণ হাতে পাল খাটাতে দেখে ক্যাপ্টেন হোপ আপন মনে বললেন: 'তোরই জিত হল দেখছি, ঠগ।' গ্রে যখন ডেক-এ নেমে এলো, হোপ তাকে নিজের কেবিনে ডেকে নিয়ে একটা ছেঁড়াখোঁড়া বই খুলে বললেন:

"মন দিয়ে শোন। তামাক-টামাক খাওয়া ছাড়! কুকুরছানাকে দিয়ে ক্যাপ্টেন করার তালিম দেওয়া শুরু হচ্ছে।"

এই বলে তিনি বই থেকে পড়তে লাগলেন, সমুদ্র সম্পর্কে প্রাচীন কথা; সত্যি বলতে গেলে কি, তিনি বকবক আর চিৎকার শুরু করে দিলেন। এটা ছিল গ্রের প্রথম পাঠ। এক বছরের মধ্যে নৌবিদ্যা, ব্যবহারিক শিক্ষা, জাহাজনির্মাণ, সমুদ্রের নিয়মকানুন, জাহাজের পথনির্দেশ এবং হিসাবরক্ষণবিদ্যার সঙ্গে সে পরিচিত হল। ক্যাপ্টেন হোপ তার হাতে হাত মেলান, ওকে উল্লেখ করতে থাকেন "আমরা" বলে।

ভাঙ্কুভারে মার চিঠি গ্রের নাগাল ধরল। সে চিঠি ছিল চোখের জল আর উদ্বেগ-আশঙ্কায় পরিপূর্ণ। গ্রে উত্তরে লিখল: "আমি জানি। কিন্তু আমি যেমন দেখছি তেমন করে যদি তুমি দেখতে পারতে! — আমার চোখ দিয়ে একবার দেখ। আমি যেমন শুনছি তেমন করে যদি তুমি শুনতে পারতে! — শঙ্খতে একবার কান লাগিয়ে শোন — তার ভেতরে শুনতে পাবে তরঙ্গের নিরন্তর কলধ্বনি; আমি যেমন ভালোবাসি তেমন করে যদি তুমি ভালোবাসতে পারতে — তাহলেই হত, তোমার চিঠিতে তাহলে আমি ভালোবাসা

আর মানুষকে ছাড়াও খুঁজে পেতাম হ্যাসি।" সে যথারীতি সমুদ্রযাত্রা চালিয়ে গেল।
অবশেষে 'আন্সেল্ম' মাল নিয়ে ডুবেল্টে এসে পেঁাছুলে বিরতির অবসরে সেখান থেকে বিশ বছর বয়সী গ্রে দুর্গের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

চারদিকে সেই একই দৃশ্য; বিশদভাবে দেখতে গেলে এবং সাধারণ অভিজ্ঞতায় সবই অক্ষুণ্ণ আছে, যেমন ছিল পাঁচ বছর আগে, কেবল তরুণ এল্মগাছগুলির পল্লব আরও ঘন হয়েছে; সদর দালানের সামনের দিকে গাছের পাতার নক্সা প্রসারিত, পল্লবিত হয়ে উঠেছে।

ঝি-চাকরেরা তাকে দেখে ছুটে এলো, তারা উল্লসিত হয়ে উঠল, তাকে দেখে এমনই ভক্তিভরে শিহরিত ও আড়ষ্ট হল যেন গতকালও এই গ্রের সঙ্গে তাদের দেখা হয়েছে। ওরা তাকে বলল মা কোথায় আছে; গ্রে উঁচু দালানের ভেতর প্রবেশ করল, নিঃশব্দে দরজা ফাঁক করে কোন সাড়াশব্দ না দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, কালো পোশাক পরনে পক্ককেশ মহিলাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন ক্রুশবিদ্ধ যিশুমূর্তির সামনে; তাঁর ব্যাকুল ফিসফিস কণ্ঠস্বর শোনাচ্ছিল পুরোদস্তুর হৃদ্স্পন্দনের মতো। "সমুদ্রযাত্রী, ভ্রমণকারী, অসুস্থ, দুঃখী এবং কারাবন্দীদিগকে..." গ্রে শুনতে শুনতে মৃদু নিশ্বাস ফেলল। এর পর মহিলা বললেন: "আর আমার বাছাকে..." একথা শোনার পর গ্রে বলল: "আমি..." কিন্তু এর চেয়ে বেশি কিছু আর তার মুখ দিয়ে বেরোল না। মা ফিরে তাকালেন। মা রোগা হয়ে গেছেন; তাঁর পাতলা গড়নের মুখের দর্পিত ভাবের মধ্যে ঝলক দিল তারুণ্যে প্রত্যাবর্তনের মতো এক নতুন অভিব্যক্তি। তিনি দ্রুত এগিয়ে এলেন পুত্রের দিকে; সংক্ষিপ্ত চাপা হাসি, সংযত উচ্ছ্বাস, চোখের জল — ব্যস্। কিন্তু এই মুহূর্তটিতে তিনি বেঁচে ছিলেন — সারা জীবন যেমন ভাবে বেঁচে ছিলেন তার চেয়েও তীব্রভাবে, পরিপূর্ণভাবে। "আমার আদরের ধন, আমার ছোট্টটি, আমি তোকে সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পেরেছি!" গ্রেও যেন সত্যি সত্যিই তার বড়ত্ব হারিয়ে ফেলল। সে তার বাবার মৃত্যুসংবাদ আগাগোড়া শুনল, তারপর নিজের কথা বলল। মা কোন রকম ভর্ৎসনা না করে, আপত্তি না তুলে মন দিয়ে শুনলেন, কিন্তু ছেলে যাকে জোর দিয়ে নিজের জীবনের সত্য বলছিল সে সবের মধ্যে তিনি মনে মনে তাঁর ছেলের মজার খেলনা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না। মহাদেশ, মহাসাগর আর জাহাজ ছিল এই ধরনের খেলনা।

গ্রে সাত দিন দুর্গে কাটাল; আটদিনের দিন প্রচুর পরিমাণ টাকাকড়ি নিয়ে ডুবেল্টে ফিরে গিয়ে সে ক্যাপ্টেন হোপকে বলল: "ধন্যবাদ। আপনি বড় উপকারী বন্ধু ছিলেন। অগ্রজ বন্ধু, বিদায়।" সে সাঁড়াশীর মতো কঠিন চাপ দিয়ে করমর্দন করে এই শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্যের উপর জোর দিল। "এখন আমি আলাদা হয়ে আমার নিজের জাহাজে সাগরে পাড়ি জমাব।" হোপ দপ করে রাগে জ্বলে উঠলেন, ক্ষেপে গিয়ে থুথু ফেললেন, ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে হনহন করে হাঁটা দিলেন, কিন্তু গ্রে তাঁর নাগাল ধরে ফেলে তাঁকে জড়িয়ে ধরল। এরপর তারা সকলে মিলে, দলবল সমেত চব্বিশজন লোক হোটেলে গিয়ে বসল, পান করল, চেঁচাল, গান গাইল, বার্-এ রান্নাঘরে যা যা ছিল সব নিঃশেষে পান করল, খেল।

আর অল্পকালের মধ্যেই ডুবেল্ট বন্দরে নতুন স্বপ্নের কালো দেহলেখের ওপর

 জবলজবল করতে দেখা গেল সন্ধ্যাতারা। এটা ছিল গ্রের কেনা 'সিক্রেট'; দশ' ষাট টন ওজনের, তিন মাস্তুলওয়ালা গ্যালিওট্। এই ভাবে ক্যাপ্টেন এবং জাহাজের মালিক হয়ে আর্থার গ্রে আরও চার বছর সমুদ্র যাত্রা করার পর শেষ পর্যন্ত ভাগ্যের ফেরে এসে পড়ল লিসে। কিন্তু তার স্মৃতিপটে চিরতরে দাগ কেটে রইল অন্তরের সঙ্গীতে পরিপূর্ণ সেই সংক্ষিপ্ত চাপা হাসি, যার পরিচয় সে পেয়েছিল বাড়ি গিয়ে; তাই বছরে বার দুয়েক সে দুর্গে যেত আর রৌপ্যকেশী সেই মহিলার মনে এই ক্ষীণ আশা রেখে যেত যে এত বড় ছেলে হয়ত বা তার খেলনা সামাল দিতে পারবে।

৩

প্রভাত

গ্রের জাহাজ 'সিক্রেট' তার পশ্চাদ্ভাগ দিয়ে সাদা রেখার ফেনার প্রবাহ ছাড়তে ছাড়তে সমুদ্র ভেদ করে চলল। লিসে সন্ধ্যাদীপের ঔজ্জ্বল্যের মধ্যে প্রশমিত হল সেই প্রবাহ। জাহাজ আলোকস্তম্ভের অনতিদূরে পোতাশ্রয়ে এসে থামল।

দশদিন ধরে 'সিক্রেট' তসরের কাপড়, কফি ও চা খালাস করল, এগারো দিনের দিন জাহাজীদের দল তীরে সময় কাটাল বিশ্রাম করে আর মদ টেনে; বারো দিনের দিন নেহাৎই অকারণে কেমন একটা চাপা বিষণ্ণ ভাব গ্রে অনুভব করল। মন খারাপ লাগার কারণ সে বুঝতে পারল না।

সকালে ঘুম থেকে উঠতে না উঠতেই তার কেন যেন মনে হচ্ছিল যে দিনটার ওপর কালো ছায়া এসে পড়ছে। সে বিষণ্ণমুখে জামাকাপড় পরল, অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রাতরাশ সারল, খবরের কাগজ পড়তে ভুলে গেল, উদ্দেশ্যহীন প্রয়াসের এক অনির্বচনীয় জগতে সমাহিত হয়ে অনেকক্ষণ ধরে ধূমপান করল; ভাসা ভাসা যে-সমস্ত কথা মনে উদয় হচ্ছিল তাদের মাঝখানে অস্বীকৃত বাসনাগুলি ইতস্তত ঘুরতে ঘুরতে একই পরিমাণ চেষ্টায় পরস্পরকে ধ্বংস করে চলল। তখন গ্রে কাজে মন দিল।

জাহাজের তত্ত্বাবধায়ক খালাসীর সঙ্গে মিলে গ্রে জাহাজ পরিদর্শন করল, পালের দড়িদড়া কষে বাঁধতে বলল, স্টিয়রিং-এর দড়ি ঢিলে করার, হৌসপাইপ সাফ করার, সামনের মাস্তুলের আগার তেকোনো পাল বদলানোর, ডেকে পিচ ঢালার, কম্পাস পরিষ্কার করার এবং জাহাজের খোলের ঢাকনা খুলিয়ে হাওয়া খেলানোর ও ঝাড়ু দেওয়ার হুকুম দিল। কিন্তু কাজ গ্রেকে আনন্দ দিতে পারল না। ব্যাকুল মন বিষণ্ণ দিনের প্রতি সম্পূর্ণ নিবদ্ধ হয়ে থাকার ফলে দিন তার কাটল বিরক্তি ও নিরানন্দের মধ্য দিয়ে: তার মনে হচ্ছিল কেউ যেন তাকে ডেকেছিল, কিন্তু কে বা কোথায় তা সে ভুলে গেছে।

সন্ধ্যার দিকে সে কেবিনে গিয়ে বসল, বই হাতে নিল, লেখকের বক্তব্যের বিরুদ্ধে সে অনেকক্ষণ প্রতিবাদ করল, বইয়ের পৃষ্ঠার খালি জায়গায় আপাতবিরোধী বিষয় সম্পর্কে মন্তব্য লিখল। কফিনের ভেতর থেকে প্রভুত্ববিস্তারকারী মৃত ব্যক্তির সঙ্গে এই আলোচনায়,

এই খেলায় সে খানিকক্ষণ মজা পেল। অতঃপর পাইপ নিয়ে সে ডুবে গেল নীল ধোঁয়ার মধ্যে, ধোঁয়ার ইতস্তত স্তরের মধ্যে উদ্ভুত মায়াময় নক্সার জগতে।

তামাকের ক্ষমতা প্রচণ্ড; তরঙ্গমালার প্রবল উচ্ছ্বাসের মধ্যে তেল ঢাললে যেমন তাদের ক্ষিপ্তা প্রশমিত হয়, তেমনি তামাকও জ্বালাময় অনুভূতিকে শান্ত করে, তাকে অনেক পরিমাণে হ্রাস করে; অনুভূতি তখন হয়ে আসে অনেক কোমল ও নীতিধর্মী। এই কারণে তিন দফায় পাইপ টানার পর গ্রের বিষণ্ণতা আক্রমণাত্মক ধর্ম হারিয়ে গভীর অন্যমনস্কতায় পরিণত হল। এই অবস্থা স্থায়ী হল আরও ঘণ্টাখানেক; মনের কুয়াসা কেটে যাবার পর গ্রে তার সংবিৎ ফিরে পেল, নড়াচড়ার প্রবল বাসনা হতে সে ডেকের ওপর উঠে এলো। বেশ রাত হয়ে এসেছে; জাহাজের বাইরে কালো জলের সুষুপ্তির মধ্যে ঝিম মেরে ছিল মাস্তুলের লণ্ঠনের আলো আর তারাদল। গণ্ডদেশের মতো উষ্ণ বাতাসে ভেসে আসছিল সমুদ্রের ঘ্রাণ। গ্রে মাথা তুলে একটা তারার স্বর্ণাভ অঙ্গারের দিকে চোখ কুঁচকে তাকাল; মুহূর্তের মধ্যে মাথাঘুরানো দূরত্ব ভেদ করে তার চোখের মণিতে এসে বিঁধল কোন এক দূর গ্রহের জ্বলন্ত সূচিকা। উপসাগরের গভীরতা ভেদ করে কানে পৌঁছোয় সন্ধ্যার শহরের চাপা কোলাহল; থেকে থেকে বাতাসের সঙ্গে সংবেদনশীল জলের ওপর দিয়ে পাড় থেকে উড়ে আসে টুকরো টুকরো কথা — এত স্পষ্ট যে মনে হয় যেন ডেকের ওপর কথাবার্তা হচ্ছে —অবশেষে মাস্তুল, পাল ও দড়িদড়া খাটানোর ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজের মধ্যে তা ডুবে যায়। জাহাজের সামনের ডেকে ফস করে জ্বলে উঠল একটা দেশলাইয়ের কাঠি, আলোকিত হয়ে উঠল হাতের আঙুল, এক জোড়া গোল গোল চোখ আর গোঁফ। গ্রে শিস দিল; পাইপের আগুন নড়তে লাগল, ভেসে চলল তার দিকে; শিগগিরই অন্ধকারের মধ্যে ক্যাপ্টেন দেখতে পেলেন প্রহরারত মানুষটির হাত ও মুখ।

"লেতিকাকে জানিয়ে দাও, ও আমার সঙ্গে যাবে," গ্রে বলল। "সঙ্গে ছিপ নেয় যেন।"

গ্রে নীচে গিয়ে নৌকায় এসে উঠে বসল, সেখানে মিনিট দশেক লেতিকার জন্য অপেক্ষা করল। লেতিকা ছোকরাটা চটপটে, তার চেহারা অনেকটা চোর-বাটপারের মতো। জাহাজের গায়ে দাঁড়ের দুমদাম আওয়াজ করে সেগুলোকে সে গ্রের হাতে তুলে দিল; তারপর নিজেও নামল, দাঁড়ের আঙটার সঙ্গে দাঁড়গুলোকে লাগাল, খাবারদাবারের থলেটা নৌকোর পেছনের অংশে গুঁজে রেখে দিল। গ্রে হাল ধরল।

"কোথায় যেতে বলেন ক্যাপ্টেন?" ডান দিকের দাঁড় দিয়ে নৌকোটাকে ঘুরপাক খাওয়াতে খাওয়াতে লেতিকা জিজ্ঞেস করল।

ক্যাপ্টেন নীরব। নাবিক জানত যে এই নীরবতার মধ্যে কথার অনুপ্রবেশ চলবে না, তাই সে নিজেও চুপ করে গিয়ে ঝপাঝপ দাঁড় ফেলতে লাগল।

গ্রে খোলা সমুদ্রের দিকে নৌকোর মুখ ফিরিয়ে দিল, তারপর চলতে লাগল বাঁ দিকের উপকূল ধরে। কোথায় যাচ্ছে তাতে তার কিছু আসে যায় না। হালের চাকা চাপা কলকল আওয়াজ তোলে; দাঁড় ক্যাঁচকোঁচ ঝপাঝপ শব্দে ওঠা-নামা করে; এছাড়া আর সর্বত্রই সমুদ্র ও নীরবতা।

এক দিনে মানুষকে এত বিপুল পরিমাণ ভাবনাচিন্তা, আবেগ-অনুভূতি, কথাবার্তা ও শব্দের প্রতি মনোযোগ দিতে হয় যে সেগুলিকে নিয়ে বেশ কয়েক খণ্ড মোটা মোটা

 বই হতে পারে। দিনের মুখছবি, একটি নির্দিষ্ট অভিব্যক্তির রূপ পরিগ্রহ করে, কিন্তু আজ গ্রে বৃথাই এই মুখ খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। দিনের অস্পষ্ট রূপরেখার মধ্যে ফুটে উঠেছে এমন এক ধরনের অনুভূতি যাদের সংখ্যা অনেক, কিন্তু যাদের নাম দেওয়া হয় নি। তাদের যে নামই দেওয়া হোক না কেন, তারা চিরকাল রয়ে যাবে সৌরভের মায়ার মতো ভাষাতীত, এমন কি ধারণাতীত। গ্রে এখন এ ধরনের এক অনুভূতিতে আবিষ্ট; সে অবশ্যই বলতে পারত: "আমি অপেক্ষা করছি, আমি দেখছি, আমি শিগগিরই জানতে পারব," কিন্তু এই কথাগুলিও স্থাপত্য পরিকল্পনার প্রসঙ্গে পৃথক পৃথক নকশার চেয়ে বেশি কিছু নয়। এই ভাবপ্রবাহের মধ্যে উদ্দীপনার প্রবল দীপ্তিও ছিল।

যেখানে তাদের নৌকো চলছিল তার বাঁ ধারে তরঙ্গিত ঘন অন্ধকারের মতো প্রকাশ পাচ্ছিল তীরভূমি। জানলার রক্তিম আভাযুক্ত কাচের ওপরে চিমনির ধোঁয়া থেকে উঠছিল স্ফুলিঙ্গ। এ হল কাপের্ণা। গালাগালি ও ঘেউ ঘেউ আওয়াজ গ্রের কানে আসছিল। গাঁয়ের আলোর বিন্দুগুলি দেখে মনে হচ্ছিল যেন এক চুল্লির পাল্লা পুড়ে পুড়ে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে আর তারই ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে জ্বলন্ত অঙ্গার। ডান দিকে ছিল মহাসাগর — নিদ্রিত মানুষের উপস্থিতির মতোই সুস্পষ্ট। কাপের্ণা পেরিয়ে গিয়ে গ্রে তীরের দিকে নৌকোর মুখ ফেরাল। এখানে তটের বুকে জল ধীরে ধীরে এসে লাগছে; লণ্ঠনের আলো জ্বেলে সে খাড়া পাড়ে দেখতে পেল কতকগুলি গর্ত আর পাড়ের উপর দিকে ঝুলন্ত কিছু উদ্‌গত অংশ। জায়গাটা তার পছন্দ হল।

"এখানে মাছ ধরব," মাঝির কাঁধে চাপড় মেরে গ্রে বলল।

নাবিক অস্পষ্ট "হুম্" উচ্চারণ করল। "এই প্রথম এরকম এক ক্যাপ্টেনের সঙ্গে চলেছি," সে বিড়বিড় করে বলল। "ক্যাপ্টেন কাজের লোক বটে, কিন্তু কেমন ধারা যেন। কঠিন ধরনের ক্যাপ্টেন। তবে যাই হোক না কেন, আমার তাকে বেশ লাগে।"

পলির ভেতরে দাঁড়টাকে পুঁতে দিয়ে সে নৌকোটা তার সঙ্গে বাঁধল, অতঃপর দুজনেই হাঁটু আর কনুইয়ে ভর দিয়ে নুড়িপাথর গড়িয়ে ফেলতে ফেলতে কষ্টেসৃষ্টে ওপরে উঠল। খাড়া পাড়ের ওপর থেকে সোজা চলে গেছে একটা ঘন জঙ্গল। কুড়ুল দিয়ে শুকনো গুঁড়ি চেরার আওয়াজ উঠল; একটা গাছ কেটে পাড়ের ওপর লেতিকা আগুন জ্বালাল। জলের ওপর আগুনের শিখার প্রতিফলন আর ছায়া নড়েচড়ে উঠল; অন্ধকার সরে যেতে ফাঁকে ফাঁকে দেখা দিল ঘাস আর ডালপালা; ধুনির ওপর ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে গিয়ে হাওয়া ঝলক দিচ্ছিল, কাঁপছিল।

গ্রে আগুনের পাশে বসল।

"এই যে বন্ধু, লেতিকা," বোতল বাড়িয়ে দিতে দিতে সে বলল, "নাও হে, মদ্যপানবর্জিত সমস্ত লোকের স্বাস্থ্য কামনায় পান কর। হ্যাঁ, একটা কথা, কুইনাইনের গন্ধ দেওয়া ভোদ্‌কা না এনে তুমি এনেছ আদার গন্ধ দেওয়া ভোদ্‌কা।"

"মাফ করবেন ক্যাপ্টেন," নাবিক নিশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বলল। "কিছু যদি মনে না করেন, মদের সঙ্গে আমি এই খাবারটা খাব..." বলেই সে চিকেন রোস্টের অর্ধেক কামড়ে ছিঁড়ে নিল এবং মুখ থেকে একটা ডানা টেনে বার করে ক্যাপ্টেনের কথার জের টেনে

বলল, "আমি জানি যে আপনি কুইনাইনের গন্ধ দেওয়া ভোদ্‌কা পছন্দ করেন। কিন্তু অন্ধকারে আমি ঠাহর করতে পারি নি, তাছাড়া তাড়াহুড়োও ছিল। আদা, বুঝলেন কিনা মানুষকে উগ্র করে তোলে। যখন আমার মারামারি করার দরকার পড়ে তখন আমি আদা দেওয়া ভোদ্‌কা খাই।"

ক্যাপ্টেন যতক্ষণ খাচ্ছিলেন আর পান করছিলেন ততক্ষণ নাবিক আড়চোখে তাকে দেখতে লাগল, পরে সামলাতে না পেরে বলল:

"আচ্ছা, সত্যিই কি ক্যাপ্টেন, আপনি বনেদী ঘরের ছেলে?"

"এটা কোন কথাই নয়, লেতিকা। যদি চাও ত ছিপ নাও, মাছ ধর।"

"আর আপনি?"

"আমি? জানি না। হয়ত। কিন্তু... পরে।"

লেতিকা ছিপের জড়ানো সুতোর পাক খুলল, সঙ্গে সঙ্গে মুখে মুখে ছড়া কাটতে লাগল। এই ব্যাপারে সে ছিল ওস্তাদ, দলের সকলে এতে দারুণ আমোদ পেত।

"একটা ডুরি আর এক টুকরো কাঠ দিয়ে আমি বানিয়েছি একটা লম্বা চাবুক আর তাতে বঁড়শী লাগিয়ে একটা টানা শিস ছাড়লাম।" এর পর সে মাছের খাবারের জন্য রাখা পোকামাকড়ের বাক্সটা হাতড়াল। "এই পোকাটা মাটির ভেতরে ঘুরঘুর করত, তার জীবন কাটে সুখে, কিন্তু এখন বঁড়শী-গাঁথা হয়ে পড়বে গিয়ে বোয়াল মাছের মুখে।" অবশেষে সে চলে গেল গান ভাঁজতে ভাঁজতে: "নির্জন রাত, খাসা ভোদ্‌কার স্বাদ ভয়ে ছটফট কর স্টার্জন, হেরিং মাছেরা হও অজ্ঞান — আজকে লেতিকা ধরবে সবারে!"

গ্রে আগুনের পাশে শুয়ে পড়ল, শুয়ে শুয়ে দেখতে লাগল জলে আলোর প্রতিফলন। সে ভাবছিল, কিন্তু তার ভাবনার মধ্যে ইচ্ছার কোন অংশ ছিল না; এই অবস্থায় মানুষের মন অন্যমনস্কভাবে নিজের পরিবেশকে ধরতে গিয়ে তাকে ভাসা ভাসা দেখে; ঠেলাঠেলি ভিড়ের মধ্যে কোন ঘোড়া যেমন লোকজনকে চাপা দিয়ে, ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে, থামিয়ে ছুটতে থাকে, চিন্তাও ছোটে তেমনি; শূন্যতা, বিহ্বলতা এবং বিলম্ব পালা করে হয় তার সঙ্গী। চিন্তা ঘুরতে থাকে বস্তুপুঞ্জের অন্তরাত্মার ভেতরে; প্রবল উত্তেজনাবশত তাড়াহুড়ো করে গোপন ইঙ্গিতের দিকে ছোটে; মাটিতে ও আকাশে ঘুরপাক খেয়ে চলে, কল্পিত ব্যক্তিদের সঙ্গে সজীব আলাপনে রত হয়, স্মৃতিচারণকে নিভিয়ে দেয়, তাকে সুশোভিত করে তোলে। এই মেঘাচ্ছন্ন গতির মধ্যে সবই জীবন্ত ও স্ফীত, সবই প্রলাপের মতো ছাড়া-ছাড়া। আর দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিশ্রামরত চৈতন্য ভাগ্য সংক্রান্ত ভাবনাচিন্তার মধ্যে সম্পূর্ণ বেমানান রূপের আকস্মিক আবির্ভাব দেখতে পেয়ে প্রায়ই হাসে: এ যেন দু বছর আগে ভাঙা একটা ডাল। আগুনের পাশে বসে এই কথাই ভাবছিল গ্রে, কিন্তু সে ছিল 'অন্য কোথাও' — এখানে নয়।

সে তার মাথা হাতের ওপর ভর দিয়ে রেখেছিল, তাতে কনুই হয়ে পড়েছিল স্যাঁতসেঁতে ও অসাড়। তারাগুলি ম্লান আলো দিচ্ছিল; আসন্ন প্রভাতের উত্তেজনায় অন্ধকার তীব্র হয়ে পড়ল। ক্যাপ্টেনের তন্দ্রা এসে গেল, কিন্তু সেটা তিনি লক্ষ করলেন না। তাঁর পান করার ইচ্ছা হল, তিনি থলের দিকে হাত বাড়ালেন, ঘুমের মধ্যেই থলের বাঁধন খুলতে লাগলেন। অতঃপর তন্দ্রা তার টুটে গেল; এর পরের দু ঘণ্টা গ্রের কাছে সেই কয়েকটি

সেকেণ্ডের বেশি মনে হল না যখন সে দু হাতের ওপর মাথা ভর দিয়ে ছিল। ইতিমধ্যে লেতিকা দুবার আগুনের ধারে আসে, ধূমপান করে, যে মাছগুলি সে ধরেছে কৌতূহলবশত তাদের মুখের ভেতরে উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করে সেখানে কী আছে। কিন্তু বলাই বাহুল্য, সেখানে কিছুই ছিল না।

ঘুম ভাঙতে গ্রে এক মুহূর্তের জন্য ভুলে গেল কী ভাবে সে এখানে এসে পড়েছে। আশ্চর্য হয়ে সে দেখতে পেল প্রভাতের সুখকর প্রভা, উজ্জ্বল ডালপালার মাঝখানে খাড়া পাড় আর ঝকঝকে নীল দূরপ্রান্ত। দিগন্তের উপরে, সেই সঙ্গে তার নিজের পায়ের উপরেও ঝুলছিল বাদামগাছের পাতা। খাড়া পাড়ের নীচে — গ্রের মনে হচ্ছিল ঠিক যেন তার পেছনে — মৃদু তরঙ্গের শোঁ শোঁ আওয়াজ। পাতা থেকে একটা শিশিরবিন্দু ঝলক দিয়ে তার তন্দ্রাজড়িত মুখের ওপর ভেঙে গড়িয়ে পড়ল, ছড়িয়ে দিল শিরশিরে প্রবাহ। গ্রে উঠে দাঁড়াল। সর্বত্র আলোকের জয়জয়কার। ক্যাম্পফায়ারের জুড়িয়ে-আসা আধপোড়া কাঠগুলি প্রাণপণে মৃদু মৃদু ধোঁয়া ছাড়ছে। তার গন্ধ বনের শ্যামলিমারে হাওয়ায় নিশ্বাস গ্রহণের পরিতৃপ্তিতে সঞ্চার করছিল একটা বন্য মাধুর্য।

লেতিকাকে দেখা গেল না। তার আর কোন দিকে হুঁশ নেই। সত্যিকারের একজন জুয়াড়ীর মতো সে মাছ ধরায় মেতে উঠেছে, গলদ্‌ঘর্ম হয়ে পড়ছে। ঘন জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে গ্রে চলল টিলার গড়ানে ধারের ওপর ছড়ানো-ছিটানো ঝোপের দিকে। ঘাস ধোঁয়া তুলছে, ঝলমল করছে। আর্দ্র ফুলগুলিকে দেখে মনে হয় যেন জোর করে কতক শিশুর হাতমুখ ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে দেওয়া হয়েছে। শ্যামল জগৎ ছোট ছোট অসংখ্য মুখ দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস নিচ্ছিল, তাদের আনন্দোচ্ছল ভিড়ের মধ্য দিয়ে চলতে গিয়ে গ্রে বাধা পাচ্ছিল। ক্যাপ্টেন বর্ণাঢ্য ফুলে ও ঘাসে ভর্তি এক ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এলো, সেখানে তার চোখে পড়ল এক ঘুমন্ত তরুণীকে।

গ্রে নিঃশব্দে হাত দিয়ে একটা ডাল সরাল এবং একটা বিপজ্জনক আবিষ্কার করেছে এই রকম উপলব্ধি নিয়ে থমকে দাঁড়াল। মাত্র পাঁচ পদক্ষেপ দূরে গুটিসুটি পাকিয়ে, একটা পা গুটিয়ে, অন্যটা প্রসারিত করে দিয়ে, দুহাত ভাঁজ করে তার উপর মাথা রেখে আরামে শুয়ে ছিল শ্রান্ত-ক্লান্ত আসল। তার চুল অবিন্যস্ত হয়ে ছড়িয়ে ছিল; গলার কাছে একটা বোতাম খুলে গিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে সাদা রঙের সামান্য গহ্বর; স্কার্টটা বিস্রস্ত হয়ে পড়ায় বেরিয়ে পড়েছে দুই হাঁটু; তন্দ্রাচ্ছন্ন তার চোখের পল্লব পড়েছে গালের ওপর, কালো চুলের আধঢাকা সামান্য স্ফীত কোমল রগের ছায়ায়; মাথার নীচে, ডান হাতের কড়ে আঙুল বেঁকে গিয়ে স্পর্শ করেছে মাথার পেছন দিক। গ্রে আলগোছে বসে পড়ে নীচ থেকে উঁকি মেরে দেখতে লাগল মেয়েটির মুখ। সে কিন্তু ভাবতেই পারে নি যে এই অবস্থায় তাকে দেখাচ্ছিল আর্নল্‌ড বেকলিনের ছবির ফনের মতো।

হয়ত অন্য কোন পরিস্থিতিতে এই মেয়েটাকে সে লক্ষ করত কেবল চোখ দিয়ে, কিন্তু এবার সে তাকে দেখল অন্য ভাবে। গ্রের ভেতরের সর্বত্র শিহরন জাগল, সর্বত্র খেলে গেল হাসির ঝলক। বলাই বাহুল্য গ্রে তাকে জানত না, তার নামও জানত না, তাছাড়া কেনই যে সে তীরে ঘুমিয়ে পড়েছে তা ত নয়ই; কিন্তু এতেই তার বেশ তৃপ্তি লাগছিল। সে কোন রকম ব্যাখ্যা আর নাম ছাড়া ছবি ভালোবাসত। এ ধরনের ছবি মনের ওপর অনেক বেশি

দাগ কাটে; তার বিষয়বস্তু কথার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না থাকার ফলে হয় অসীম, সমস্ত রকম অনুমান ও চিন্তাভাবনার সমর্থক।

পাতার ছায়া ক্রমেই গাছের কাণ্ডের দিকে এগিয়ে আসছিল, কিন্তু গ্রে তখনও বসে ছিল সেই কষ্টকর ভঙ্গিতে। মেয়েটির দেহ ঘিরে সবই ঘুমুচ্ছিল: তার কালো চুল ঘুমুচ্ছিল, ঘুমুচ্ছিল তার স্কার্ট আর স্কার্টের ভাঁজ; এমন কি তার শরীরের আশেপাশের ঘাসও যেন মনে হচ্ছিল সহমর্মিতাবশত ঝিমুচ্ছিল। ধারণাটা পরিপূর্ণ রূপ ধারণ করতে গ্রে তার ঈষদুষ্ণ তরঙ্গের বিপুল প্রবাহে প্রবেশ করল, তার সঙ্গে সঙ্গে ভেসে চলল। এদিকে লেতিকা অনেকক্ষণ ধরে চেঁচিয়ে চলেছে: "ক্যাপ্টেন, আপনি কোথায়?" কিন্তু ক্যাপ্টেন তার কথা শুনতে পেল না।

শেষ পর্যন্ত যখন সে উঠে দাঁড়াল তখন অসাধারণের প্রতি ঝোঁক এক ক্রুদ্ধা নারীর দৃঢ়সংকল্প ও প্রেরণা নিয়ে অকস্মাৎ তার ওপর এসে ভর করল। মোহাচ্ছন্নের মতো তার বশবর্তী হয়ে সে আঙ্গুল থেকে পুরনো দামী আঙটিটা খুলে নিল। সে সময় সঙ্গত কারণেই মনে মনে সে চিন্তা করল যে হয়ত এই ভাবে সে শুদ্ধ বানানের মতো জীবনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটার প্রতি ইঙ্গিত করছে। মাথার নীচ থেকে যে সাদা কড়ে আঙ্গুলটি ঝকঝক করছিল, গ্রে সন্তর্পণে তার ভেতরে আঙটি গলিয়ে দিল। কড়ে আঙ্গুলটি অস্বস্তির সঙ্গে নড়েচড়ে উঠে স্থির হয়ে গেল। এই বিশ্রামরত মুখের দিকে আর একবার দৃষ্টিপাত করার পর গ্রে পেছন দিকে ঘুরতেই ঝোপের মধ্যে দেখতে পেল নাবিকের ভুরু কপালে উঠে গেছে। সে অবাক হয়ে হাঁ করে দেখছিল গ্রের কাণ্ডকারখানা।

"ও তুমি নাকি লেটিকা?" গ্রে বলল। "এর দিকে একবার তাকিয়ে দেখ দেখি। কেমন, সুন্দর?"

"অপূর্ব! পটে আঁকা ছবির মতো!" নাবিক চাপা গলায় চেঁচিয়ে বলল। সে কেতাবী ভাষায় কথা বলতে ভালোবাসত। "জায়গাটা সত্যিই চমৎকার বাছা হয়েছে। আমি চারটে মোরে মাছ ধরেছি, আরও একটা কী যেন থল্থলে, পটকার মতো দেখতে।"

"আস্তে, লেতিকা। চল এখান থেকে সরে যাই।"

তারা ঝোপের মধ্যে সরে গেল। এখন তাদের নৌকোর দিকে ফেরাই সঙ্গত হত, কিন্তু গ্রে গড়িমসি করতে লাগল, সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল নীচু উপকূলভাগের দূরে প্রান্ত, যেখানে সবুজ গাছপালা আর বালির মাথার ওপরে কাপের্ণার চিমনিগুলো থেকে গলগল করে উঠছিল সকালের ধোঁয়া। এই ধোঁয়ার মধ্যে সে আবার দেখতে পেল মেয়েটিকে।

তখন সে মন স্থির করে ঘুরে গিয়ে ঢালু বরাবর নামতে লাগল। কী ঘটেছে জিজ্ঞেস না করে নাবিক পেছন পেছন চলল। সে অনুভব করছিল যে আবার শুরু হয়েছে বাধ্যতামূলক নীরবতা। প্রথম যে বাড়িগুলি তারা পেল সেগুলির কাছাকাছি আসতেই গ্রে হঠাৎ বলল:

"লেতিকা, তোমার অভিজ্ঞ চোখ দিয়ে তুমি কি ঠিক বলতে পার এখানে সরাইখানা কোথায় হতে পারে?"

সেকেণ্ডের বেশি মনে হল না যখন সে দু হাতের ওপর মাথা ভর দিয়ে ছিল। ইতিমধ্যে লেতিকা দুবার আগুনের ধারে আসে, ধূমপান করে, যে মাছগুলি সে ধরেছে কৌতূহলবশত তাদের মুখের ভেতরে উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করে সেখানে কী আছে। কিন্তু বলাই বাহুল্য, সেখানে কিছুই ছিল না।

ঘুম ভাঙতে গ্রে এক মুহূর্তের জন্য ভুলে গেল কী ভাবে সে এখানে এসে পড়েছে। আশ্চর্য হয়ে সে দেখতে পেল প্রভাতের সুখকর প্রভা, উজ্জ্বল ডালপালার মাঝখানে খাড়া পাড় আর ঝকঝকে নীল দূরপ্রান্ত। দিগন্তের উপরে, সেই সঙ্গে তার নিজের পায়ের উপরেও ঝুলছিল বাদামগাছের পাতা। খাড়া পাড়ের নীচে — গ্রের মনে হচ্ছিল ঠিক যেন তার পেছনে — মৃদু তরঙ্গের শোঁ শোঁ আওয়াজ। পাতা থেকে একটা শিশিরবিন্দু ঝলক দিয়ে তার তন্দ্রাজড়িত মুখের ওপর ভেঙে গড়িয়ে পড়ল, ছড়িয়ে দিল শিরশিরে প্রবাহ। গ্রে উঠে দাঁড়াল। সর্বত্র আলোকের জয়জয়কার। ক্যাম্পফায়ারের জুড়িয়ে-আসা আধপোড়া কাঠগুলি প্রাণপণে মৃদু মৃদু ধোঁয়া ছাড়ছে। তার গন্ধ বনের শ্যামলিমার হাওয়ায় নিশ্বাস গ্রহণের পরিতৃপ্তিতে সঞ্চার করছিল একটা বন্য মাধুর্য।

লেতিকাকে দেখা গেল না। তার আর কোন দিকে হুঁশ নেই। সত্যিকারের একজন জুয়াড়ীর মতো সে মাছ ধরায় মেতে উঠেছে, গলদ্ঘর্ম হয়ে পড়ছে। ঘন জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে গ্রে চলল টিলার গড়ানে ধারের ওপর ছড়ানো-ছিটানো ঝোপের দিকে। ঘাস ধোঁয়া তুলছে, ঝলমল করছে। আর্দ্র ফুলগুলিকে দেখে মনে হয় যেন জোর করে কতক শিশুর হাতমুখ ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে দেওয়া হয়েছে। শ্যামল জগৎ ছোট ছোট অসংখ্য মুখ দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস নিচ্ছিল, তাদের আনন্দোচ্ছল ভিড়ের মধ্য দিয়ে চলতে গিয়ে গ্রে বাধা পাচ্ছিল। ক্যাপ্টেন বর্ণাঢ্য ফুলে ও ঘাসে ভর্তি এক ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এলো, সেখানে তার চোখে পড়ল এক ঘুমন্ত তরুণীকে।

গ্রে নিঃশব্দে হাত দিয়ে একটা ডাল সরাল এবং একটা বিপজ্জনক আবিষ্কার করেছে এই রকম উপলব্ধি নিয়ে থমকে দাঁড়াল। মাত্র পাঁচ পদক্ষেপ দূরে গুটিসুটি পাকিয়ে, একটা পা গুটিয়ে, অন্যটা প্রসারিত করে দিয়ে, দুহাত ভাঁজ করে তার উপর মাথা রেখে আরামে শুয়ে ছিল শ্রান্ত-ক্লান্ত আসল। তার চুল অবিন্যস্ত হয়ে ছড়িয়ে ছিল; গলার কাছে একটা বোতাম খুলে গিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে সাদা রঙের সামান্য গহ্বর; স্কার্টটা বিস্রস্ত হয়ে পড়ায় বেরিয়ে পড়েছে দুই হাঁটু; তন্দ্রাচ্ছন্ন তার চোখের পল্লব পড়েছে গালের ওপর, কালো চুলের আধঢাকা সামান্য স্ফীত কোমল রগের ছায়ায়; মাথার নীচে, ডান হাতের কড়ে আঙুল বেঁকে গিয়ে স্পর্শ করেছে মাথার পেছন দিক। গ্রে আলগোছে বসে পড়ে নীচ থেকে উঁকি মেরে দেখতে লাগল মেয়েটির মুখ। সে কিন্তু ভাবতেই পারে নি যে এই অবস্থায় তাকে দেখাচ্ছিল আর্নল্ড বেকলিনের ছবির ফনের মতো।

হয়ত অন্য কোন পরিস্থিতিতে এই মেয়েটাকে সে লক্ষ করত কেবল চোখ দিয়ে, কিন্তু এবার সে তাকে দেখল অন্য ভাবে। গ্রের ভেতরের সর্বত্র শিহরন জাগল, সর্বত্র খেলে গেল হাসির ঝলক। বলাই বাহুল্য গ্রে তাকে জানত না, তার নামও জানত না, তাছাড়া কেনই যে সে তীরে ঘুমিয়ে পড়েছে তা ত নয়ই; কিন্তু এতেই তার বেশ তৃপ্তি লাগছিল। সে কোন রকম ব্যাখ্যা আর নাম ছাড়া ছবি ভালোবাসত। এ ধরনের ছবি মনের ওপর অনেক বেশি

দাগ কাটে; তার বিষয়বস্তু কথার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না থাকার ফলে হয় অসীম, সমস্ত রকম অনুমান ও চিন্তাভাবনার সমর্থক।

পাতার ছায়া ক্রমেই গাছের কাণ্ডের দিকে এগিয়ে আসছিল, কিন্তু গ্রে তখনও বসে ছিল সেই কণ্টকর ভঙ্গিতে। মেয়েটির দেহ ঘিরে সবই ঘুমুচ্ছিল: তার কালো চুল ঘুমুচ্ছিল, ঘুমুচ্ছিল তার স্কার্ট আর স্কার্টের ভাঁজ; এমন কি তার শরীরের আশেপাশের ঘাসও যেন মনে হচ্ছিল সহমর্মিতাবশত ঝিমুচ্ছিল। ধারণাটা পরিপূর্ণ রূপ ধারণ করতে গ্রে তার ঈষদুষ্ণ তরঙ্গের বিপুল প্রবাহে প্রবেশ করল, তার সঙ্গে সঙ্গে ভেসে চলল। এদিকে লেতিকা অনেকক্ষণ ধরে চেঁচিয়ে চলেছে: "ক্যাপ্টেন, আপনি কোথায়?" কিন্তু ক্যাপ্টেন তার কথা শুনতে পেল না।

শেষ পর্যন্ত যখন সে উঠে দাঁড়াল তখন অসাধারণের প্রতি ঝোঁক এক ক্রুদ্ধা নারীর দৃঢ়সংকল্প ও প্রেরণা নিয়ে অকস্মাৎ তার ওপর এসে ভর করল। মোহাচ্ছন্নের মতো তার বশবর্তী হয়ে সে আঙুল থেকে পুরনো দামী আঙটিটা খুলে নিল। সে সময় সঙ্গত কারণেই মনে মনে সে চিন্তা করল যে হয়ত এই ভাবে সে শুদ্ধ বানানের মতো জীবনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটার প্রতি ইঙ্গিত করছে। মাথার নীচ থেকে যে সাদা কড়ে আঙুলটি ঝকঝক করছিল, গ্রে সন্তর্পণে তার ভেতরে আঙটি গলিয়ে দিল। কড়ে আঙুলটি অস্বস্তির সঙ্গে নড়েচড়ে উঠে স্থির হয়ে গেল। এই বিশ্রামরত মুখের দিকে আর একবার দৃষ্টিপাত করার পর গ্রে পেছন দিকে ঘুরতেই ঝোপের মধ্যে দেখতে পেল নাবিকের ভুরু কপালে উঠে গেছে। সে অবাক হয়ে হাঁ করে দেখছিল গ্রের কাণ্ডকারখানা।

"ও তুমি নাকি লেটিকা?" গ্রে বলল। "এর দিকে একবার তাকিয়ে দেখ দেখি। কেমন, সুন্দর?"

"অপূর্ব! পটে আঁকা ছবির মতো!" নাবিক চাপা গলায় চেঁচিয়ে বলল। সে কেতাবী ভাষায় কথা বলতে ভালোবাসত। "জায়গাটা সত্যিই চমৎকার বাছা হয়েছে। আমি চারটে মোরে মাছ ধরেছি, আরও একটা কী যেন থলথলে, পটকার মতো দেখতে।"

"আস্তে, লেতিকা। চল এখান থেকে সরে যাই।"

তারা ঝোপের মধ্যে সরে গেল। এখন তাদের নৌকোর দিকে ফেরাই সঙ্গত হত, কিন্তু গ্রে গড়িমসি করতে লাগল, সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল নীচু উপকূলভাগের দূরে প্রান্ত, যেখানে সবুজ গাছপালা আর বালির মাথার ওপরে কাপের্ণার চিমনিগুলো থেকে গলগল করে উঠছিল সকালের ধোঁয়া। এই ধোঁয়ার মধ্যে সে আবার দেখতে পেল মেয়েটিকে।

তখন সে মন স্থির করে ঘুরে গিয়ে ঢালু বরাবর নামতে লাগল। কী ঘটেছে জিজ্ঞেস না করে নাবিক পেছন পেছন চলল। সে অনুভব করছিল যে আবার শুরু হয়েছে বাধ্যতামূলক নীরবতা। প্রথম যে বাড়িগুলি তারা পেল সেগুলির কাছাকাছি আসতেই গ্রে হঠাৎ বলল:

"লেতিকা, তোমার অভিজ্ঞ চোখ দিয়ে তুমি কি ঠিক বলতে পার এখানে সরাইখানা কোথায় হতে পারে?"

 "ঐ কালো চালাটা হবে সম্ভবত," লেতিকা ভেবেচিন্তে বলল, "তবে হ্যাঁ, নাও হতে পারে।"

"আচ্ছা এই চালাটার বিশেষত্ব কী?"

"আমি নিজেই জানি না ক্যাপ্টেন। কেবল আমার মন বলছে — এর বেশি কিছু নয়।"

তারা বাড়িটার দিকে এগিয়ে এলো। ওটা বাস্তবিকই ছিল সরাইখানা — মেনের্সের সরাইখানা। খোলা জানলা দিয়ে চোখে পড়ছিল টেবিলের ওপর রাখা বোতল; তার পাশে কার যেন একটা নোংরা হাত কাঁচাপাকা গোঁফ মোচড়াচ্ছিল।

অত সকাল সকাল সত্ত্বেও সরাইখানার কমন রুমটা জাঁকিয়ে ছিল তিনজন লোক। জানলার ধারে বসে ছিল কয়লাওয়ালা, ইতিমধ্যেই আমাদের নজরে পড়া সেই মাতাল গোঁফজোড়ার অধিকারী; ঘরের ভেতরের দরজা ও বার-এর মাঝখানে ডিমের পোচ আর বীয়ার নিয়ে বসে ছিল দুই জেলে। কাউন্টারের পেছনে মেনের্স বাসন মুছছিল। মেনের্স অল্প বয়স্ক ঢ্যাঙা ছোকরা, তার মুখে ছুলির দাগ, বিরস ধরনের মুখ, তার চোখের ক্ষীণ দৃষ্টিতে এমন একটা বিশেষ ধূর্ত ছটফটে ভাব ছিল যা সাধারণভাবে ব্যবসায়ীদেরই বৈশিষ্ট্যসূচক। নোংরা মেঝের ওপর পড়ে ছিল সূর্যালোকিত জানলার ছাপ।

ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন আলোর জায়গাটায় গ্রে পদার্পণ করা মাত্র মেনের্স তার ঘুপচি থেকে বেরিয়ে এসে ভক্তিভরে মাথা নোয়াল। গ্রেকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে মেনের্স তাকে খাঁটি ক্যাপ্টেন বলে অনুমান করতে পারল — এ শ্রেণীর অতিথি এখানে কদাচিৎ চোখে পড়ে। গ্রে রাম অর্ডার দিল। লোকজনের নিত্যকার হুটোপাটির ফলে হলুদ ছোপ ধরা চাদর টেবিলের ওপর বিছিয়ে দিয়ে মেনের্স বোতল এনে রাখল, কিন্তু তার আগে বোতলের লেবেলের খুলে যাওয়া কোনাটা সে জিভের ডগা দিয়ে চেটে সেঁটে দিল। এরপর কাউন্টারের পেছনে ফিরে গিয়ে সে মনোযোগ দিয়ে কখনও গ্রেকে দেখতে লাগল, কখনও বা প্লেটের দিকে তাকিয়ে সেখান থেকে নখ দিয়ে খুঁটে খুঁটে শুকিয়ে যাওয়া কিছু একটা তুলতে লাগল।

লেতিকা যখন দু হাতে গ্লাস তুলে ধরে বিনম্র ভঙ্গিতে গ্লাসের সঙ্গে ফিসফিসিয়ে কথা বলছিল এবং জানলার দিকে তাকাচ্ছিল তখন হিন মেনের্সকে গ্রে কাছে ডাকল। হিন আত্মপ্রসাদের ভাব নিয়ে চেয়ারের এক কোনায় গিয়ে বসল। তাকে সম্বোধন করায় সে গদগদ হয়ে পড়ল, বিশেষত এই কারণে গদগদ হয়ে পড়ল যে গ্রে তাকে সম্বোধন করেছে স্রেফ আঙুল নেড়ে।

"আপনি নিশ্চয়ই এখানকার সব বাসিন্দাকে জানেন," গ্রে শান্তস্বরে কথা শুরু করল। "আমি একজন তরুণীর নাম জানতে চাই। তার মাথায় রুমাল বাঁধা, গায়ের পোশাক গোলাপী ফুলের ছাপ মারা। মেয়েটার চুল ঘন লালচে, সে লম্বায় মাঝারি, বয়স তার সতেরো থেকে কুড়ির মধ্যে। এখান থেকে সামান্য দূরে তাকে আমি দেখেছিলাম। নামটা কী, বলতে পারেন?"

সে এমন সাবলীল অথচ জোরাল ভঙ্গিতে কথাটা বলল যে তার এই স্বরকে এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল। হিন মেনের্স ভেতরে ভেতরে ছটফটিয়ে উঠল, এমন কি মৃদু হাসলও, কিন্তু বাইরে সম্বোধনের এই প্রকৃতির কাছে তাকে বশ্যতা স্বীকার করতে হল।

তবে জবাব দেওয়ার আগে সে একটু চুপ করে রইল — সে হল নেহাৎই ব্যাপারটা আঁচ করার নিষ্ফল চেষ্টাবশত।

"হুম্!" ছাদের দিকে চোখ তুলে সে বলল। "এটা নির্ঘাত 'জাহাজওয়ালী আসল', ও ছাড়া আর কেউ নয়। মেয়েটা হাবাগোবা গোছের।"

"সত্যিই নাকি?" পানীয়ে বড় একটা চুমুক দিতে দিতে উদাসীন ভাবে গ্রে বলল। "এমন কী করে হল?"

"নেহাৎই যদি শুনতে চান ত বলি।"

হিন তখন গ্রেকে বলল বছর সাতেক আগেকার ঘটনা, যখন এক লোকগীতি সংগ্রাহকের সঙ্গে সমুদ্রতীরে মেয়েটির কথা হয়। বলাই বাহুল্য, জনৈক ভিখিরি যখন এই সরাইখানায়ই উক্ত কাহিনীর সত্যতা জোর দিয়ে বলে তার পর থেকে তা স্থূল ও মামুলি গালগল্পের রূপ ধারণ করে, তবে মূল বক্তব্যের কোন হেরফের হয় না।

মেনের্স বলল, "এর পর থেকে তার ঐ নাম হয়ে গেছে, 'জাহাজওয়ালী আসল' নাম দিয়েছে লোকে।"

লেতিকা তখনও আগের মতোই শান্ত বিনীত। গ্রে একবার যন্ত্রচালিতের মতো তার দিকে তাকাল, তারপর গ্রের চোখ পড়ল সরাইখানার সংলগ্ন ধূলিময় রাস্তার দিকে, সে যেন অনুভব করল একটা ধাক্কা — একই সঙ্গে ধাক্কা এসে লাগল যেন তার বুকে ও মাথায়। রাস্তায় তারই মুখোমুখি চলেছে খোদ সেই জাহাজওয়ালী আসল, যার সম্পর্কে মেনের্স এইমাত্র ডাক্তারী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বক্তব্য প্রকাশ করেছে। তার মুখের যে আশ্চর্য আদল অবিস্মরণীয় উত্তেজনাকর, অথচ সহজ সরল কথার রহস্যকে মনে করিয়ে দেয় এখন তা দৃষ্টির আলোকে দেখা দিল গ্রের সামনে। নাবিক আর মেনের্স বসে ছিল জানলার দিকে পিঠ করে, কিন্তু তারা যাতে দৈবাৎ পেছন ফিরে না তাকায় সেই উদ্দেশ্যে গ্রে সাহস করে চোখ সরিয়ে হিনের কটা চোখের ওপর দৃষ্টি ফেলল। আসলের চোখ দেখার পর মেনের্সের মুখ থেকে শোনা সমস্ত বদ্ধমূল ধারণা কেটে গেল। হিন কিন্তু কোন রকম সন্দেহ না করে বলে চলল:

"আরও একটা কথা বলতে পারি আপনাকে — ওর বাপটা হল বদের ধাড়ি। আমার বাবাকে এমন ভাবে ডুবিয়ে মেরেছে যেন উনি বেড়াল বা ঐরকম কোন জীব... ভগবান আমাকে মাপ করুন। ও হল..."

পেছন দিক থেকে একটা আকস্মিক বন্য গর্জনে গ্রের কথায় বাধা পড়ল। কয়লাওয়ালা ঝিম মারা অবস্থা থেকে গা ঝাড়া দিয়ে চোখ পাকাতে পাকাতে হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে এমন গাঁক গাঁক করে গান ধরল যে সকলে কেঁপে উঠল:

"ঝুড়িওয়ালা ঝুড়িওয়ালা
দিব্যি ছাড়াও ছাল চামড়া!"

"আবার গিলেছিস, পাজি, ইতর কোথাকার!" মেনের্স চেঁচিয়ে বলল। "ভাগ এখান থেকে!"

"বলছি ভালো বুঝবে ঠেলা
বাগে তোমায় পাই আমরা!.."

 কয়লাওয়ালা চিৎকার-চেঁচামেচি থামাল, এবং যেন কিছুই হয় নি এমন ভাব করে ছলকানো গেলাসের মধ্যে গোঁফ ডুবিয়ে দিল।

হিন মেনের্স ঘৃণায় ও ক্রোধে কাঁধ ঝাঁকাল।

"জঘন্য, মানুষ নয়," একজন কৃপণ লোকের উপযুক্ত ভয়ানক গুরুগম্ভীর ভাব নিয়ে সে বলল। "প্রত্যেকবার একই ঘটনা!"

"এর থেকে বেশি আর কিছু আপনি বলতে পারেন না?" গ্রে জিজ্ঞেস করল।

"আমি? তবে আর আমি আপনাকে বলছি কী, বাপটা হল বদের ধাড়ি। তারই কারণে, মশাই, আমি অনাথ হলাম, আর একেবারে বাচ্চা বয়স থেকেই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রুজি রোজগারে নামতে বাধ্য হই..."

"মিথ্যে কথা!" কয়লাওয়ালা আচমকা বলে উঠল। "এত জঘন্য রকমের আর অস্বাভাবিক মিথ্যে কথা বলছিস যে আমার নেশা কেটে গেল।"

হিনকে মুখ খোলার সুযোগ না দিয়ে গ্রেকে উদ্দেশ্য করে কয়লাওয়ালা বলল:

"ও মিথ্যে কথা বলছে। ওর বাপটাও ছিল মিথ্যেবাদী; ওর মা-ও। ওদের বংশের ধারাই এই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে মেয়েটা আমার-আপনার মতোই সুস্থ। আমি ওর সঙ্গে কথা বলে দেখেছি। ও আমার গাড়িতে চুরাশি বার বসেছে, কিংবা কিছুটা কমও হতে পারে। কোন মেয়ে যখন শহর থেকে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফেরে আর আমার কয়লা যদি বিক্রি হয়ে যায়, তাহলে আমি অবশ্যই তাকে আমার গাড়িতে চাপাব। চড়ুক না গাড়িতে। আমি বলছি, ওর মাথাটা খাসা। এটা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে, হিন মেনের্স, তোর সঙ্গে ও ভুলেও কোন কথা বলবে না। আমি, মশাই, স্বাধীন কয়লার কারবারী—এই সব বিচার আর গল্পগুজবের ধার ধারি না। মেয়েটা কথা বলে বড়দের মতো, কিন্তু ওর কথা বলার ধরনটা বড় অদ্ভুত। ভালো করে শুনলে মনে হবে যেন আমি-আপনি যা বলি তা-ই, তা-ই বটে, আবার ঠিক তা-ও নয়। এই যেমন ধরুন না, একবার ওর হাতের কাজ নিয়ে কথা ওঠে। ঘণ্টা-মিনার আঁকড়ে-ধরে-থাকা মাছির মতো আমার কাঁধ আঁকড়ে ধরে ও বলে, "আমি তোমাকে একটা কথা বলব, আমার কাজটা একঘেয়ে নয়, কেবল আমার একমাত্র ইচ্ছে হল বিশেষ ধরনের একটা কিছু ভেবে বার করা।" বলে, "আমার বড় ইচ্ছে এমন কোন কৌশল বার করি যাতে আমার তক্তার নৌকো নিজে নিজে ভেসে বেড়ায়, আর মাঝিরা সত্যিকারের দাঁড় বায়; তারপর তারা তীরে এসে ভিড়বে, নৌকো ঘাটে বাঁধবে, আর হুবহু জ্যান্ত মানুষদের মতো, ঠিক তাদেরই ধরনে পাড়ে বসে জলখাবার খাবে।" আমি এতে হো হো করে হেসে উঠলাম, বুঝলেন কিনা, ব্যাপারটা আমার কাছে হাস্যকর মনে হল। আমি বললাম, "বুঝলে আসল, তোমার কাজটা এই ধরনের কিনা, তাই তোমার চিন্তাভাবনাও এই রকমের, কিন্তু আশেপাশে চেয়ে দেখ, লোকে কাজ করছে না ত, যেন মারপিট করছে।" "না," ও বলল, "আমি জানি আমি কী জানি। জেলে যখন মাছ ধরে তখন সে ভাবে এমন বড় মাছ ধরবে যেমন আর কেউ ধরতে পারে নি।" "আচ্ছা, আমার কথা তাহলে কী বলবে?" "তুমি?" ও হাসতে হাসতে বলল, "তুমি যখন ঝুড়িতে কয়লা ঢাল তখন নিশ্চয়ই মনে কর যে ওটাতে ফুল ফুটবে।" বুঝুন একবার, কী কথাটা ও বলল। ঠিক সেই মুহূর্তে, স্বীকার না করে পারছি না, কিসের টানে যেন

আমি খালি ঝুড়িটার দিকে তাকালাম, আর চোখ পড়তেই আমার মনে হল বুঝি ঝুড়ির
পাকানো ডালগুলো থেকে কুঁড়ি বেরিয়েছে, কুঁড়িগুলো ফেটে গিয়ে ঝুড়ির ওপর রাশি রাশি পাতা ছিটিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমার নেশা খানিকটা কেটেই গেল ছাই! অথচ এই হিন মেনের্সটার মিথ্যে কথা বলতে একটুও বাধে না — ওকে আমার চেনা আছে!"

কথাবার্তা স্পষ্টই অপমানজনক পর্যায়ে চলে এসেছে বিবেচনা করে মেনের্স জ্বলন্ত দৃষ্টিতে কয়লাওয়ালার দিকে তাকাল, সে কাউণ্টারের আড়ালে চলে গেল এবং সেখান থেকে তিক্তকণ্ঠে প্রশ্ন করল:

"আর কিছু অর্ডার দেবেন কি?"

"না," টাকা বার করতে করতে গ্রে বলল, "আমরা উঠছি, চললাম। লেতিকা, তুমি এখানে থাকবে, সন্ধ্যার সময় ফিরে আসবে, চুপ করে থাকবে। যতটা জানতে পার জানার পর আমাকে খবর দেবে। বুঝতে পেরেছ?"

"হ্যাঁ গো আমার ক্যাপ্টেন," রামের প্রভাবে বেশ খানিকটা অন্তরঙ্গ সুরে লেতিকা বলল, "এটা কেবল একজন কালার পক্ষেই না বোঝা সম্ভব।"

"চমৎকার। তাহলে এ-ও মনে রেখ যে যা-ই ঘটুক না কেন কোন ক্ষেত্রেই আমার কথা বলা চলবে না, এমন কি আমার নামও উল্লেখ করা চলবে না। আচ্ছা, চলি!"

গ্রে চলে গেল। এই সময় থেকে বিস্ময়কর আবিষ্কারের অনুভূতি তাকে দহন করতে থাকে বের্টহোলডের বারুদের হামানদিস্তায় আকস্মিক স্ফুলিঙ্গের ঝলকের মতো। এ হল সেই সমস্ত মানসিক ধসের একটি যার নীচ থেকে ঝলক দিয়ে বেরিয়ে আসে আগুন। অবিলম্বে কাজে নামার মনোভাব তাকে পেয়ে বসল। যখন সে নৌকোয় গিয়ে বসল কেবল তখনই প্রকৃতিস্থ হল, গুছিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে পারল। হাসতে হাসতে সে হাত ওপরে উঠিয়ে উত্তপ্ত সূর্যের দিকে করতল বাড়িয়ে দিল যেমন একবার ছোটবেলায় করেছিল মদের ভূগর্ভ কুঠরিতে; তারপর নৌকো ছেড়ে দিল, দ্রুত দাঁড় ফেলতে লাগল জাহাজ-ঘাটার উদ্দেশে।

৪

আগের দিন

এর আগের দিন এবং লোকগীতির সংগ্রাহক এগ্‌ল যখন সমুদ্রতীরে বালিকাকে রাঙা পাল তোলা জাহাজের রূপকথা বলেন, তার সাত বছর বাদে এক দিন, প্রতি সপ্তাহে আসল যেমন খেলনার দোকানে যায় তেমনি সেখানে যাবার পর মন খারাপ করে বাড়ি ফিরে এলো, তার মুখ বিষণ্ণ। বিক্রির জন্য সে যে জিনিস নিয়ে গিয়েছিল তা ফিরিয়ে এনেছে। সে এত বেশি বিচলিত হয়ে পড়েছিল যে প্রথমে কোন কথাই বলতে পারল না, কিন্তু লংগ্রেনের উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে এবং বাস্তবে যা ঘটেছে লংগ্রেন তার চেয়েও অনেক খারাপ কিছু আশঙ্কা করছে দেখে সে জানলার পাশে যেমন দাঁড়িয়ে ছিল সেই অবস্থায়

 অন্যমনস্ক ভাবে সমুদ্র দেখতে দেখতে, জানলার কাচের ওপর আঙুল বুলাতে বুলাতে ঘটনাটা বলতে শুরু করল।

খেলনার দোকানের মালিক এবারে লেনদেন শুরু করার আগে হিসাবের খাতা খুলে তাকে দেখায় তার কাছে ওদের ঋণের পরিমাণ। বিরাট আকারের তিন অঙ্কের সংখ্যা দেখে সে চমকে উঠল। ব্যবসায়ী বলল, "এই দেখ না, ডিসেম্বর থেকে শুরু করে তোমরা কত নিয়েছ, আর এই দেখ, কত বিক্রি হয়েছে।" বলে সে আরও একটি সংখ্যার ওপর আঙুল রাখল, কিন্তু সেটা ছিল দু অঙ্কের। "চোখে দেখা করুণ, অপমানের। তার চোখ দেখে বুঝতে পারলাম সে অভদ্র, আর রেগে আছে। আমি পালাতে পারলেই খুশি হতাম, কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে কি এত লজ্জায় পড়ে গিয়েছিলাম যে সে ক্ষমতাও ছিল না। সে আমাকে বলতে লাগল: "শোনো গো মেয়ে, এটা আমার পক্ষে আর লাভের নয়। এখন বিদেশী জিনিসপত্রের কদর, সমস্ত দোকান সে সবে ভর্তি, এগুলো কেউ নেয় না।" এই কথা সে বলল। এটা-সেটা আরও অনেক কথা সে বলেছিল, কিন্তু আমি সমস্ত গুলিয়ে ফেলেছি, ভুলে গেছি। মনে হচ্ছে আমার জন্য তার বোধ হয় দুঃখই হয়েছিল, তাই পরামর্শ দিল 'শিশুমেলায়' ও 'আলাদিনের প্রদীপে' গিয়ে চেষ্টা করতে।"

আসল কথাটা বলে ফেলার পর মেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে ভয়ে-ভয়ে বৃদ্ধের দিকে তাকাল। হাঁটুর ওপর কনুই ভর দিয়ে দু হাঁটুর মাঝখানে দু হাতের আঙুলে আঙুল লাগিয়ে লংগ্রেন মাথা গুঁজে বসে ছিল। মেয়ের দৃষ্টি অনুভব করে সে মাথা তুলল, দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মেয়ে মনের ভার সামলে নিয়ে বাপের কাছে ছুটে এলো, তার পাশে এসে বসল, তারপর তার জ্যাকেটের চামড়ার হাতার নীচে নিজের কোমল হাত চালিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে নীচ থেকে বাপের মুখের দিকে উঁকি মেরে সজীবতার ভাব দেখিয়ে বলে চলল:

"কিছু না, এসব কিছুই না, আরও যা বলছি শোন। আমি ত চললাম। যাই হোক, এলাম বিরাট, ভয়ঙ্কর দোকানটায়; সেখানে লোকের যা ভিড়! লোকে আমাকে ঠেলা মারতে লাগল; আমি কিন্তু তারই মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে এসে হাজির হলাম একজনের কাছে, যার চুল কালো আর চোখে চশমা। তাকে আমি কী বললাম কিছুই মনে নেই; শেষকালে সে বাঁকা হাসি হেসে আমার ঝুড়ি হাতড়াল, কিছু খেলনা দেখল, তারপর আবার যেমনকার তেমন রুমালে মুড়ে ফেরত দিয়ে দিল।"

শুনতে শুনতে লংগ্রেনের রাগ ধরে যাচ্ছিল। সে যেন তার মেয়েকে দামী দামী জিনিসপত্রে বোঝাই দোকানের সামনে বড়লোকদের ভিড়ের মধ্যে স্তম্ভিত অবস্থায় দেখতে পেল। চশমা-চোখে ফিটফাট লোকটি দয়াপরবশ হয়ে তাকে বলল যে সে যদি লংগ্রেনের এই সাদামাঠা জিনিসগুলো বেচতে যায় তাহলে নির্ঘাত সর্বস্বান্ত হবে। তাচ্ছিল্যভরে এবং কায়দা করে সে আসলের সামনে কাউন্টারের ওপর রাখল খোলা-বন্ধ করার উপযোগী দালানকোঠা ও রেলসেতুর মডেল; খুদে আকারের নিখুঁত মোটরগাড়ি, ইলেকট্রিক সেট, এরোপ্লেন আর ইঞ্জিন। এই সমস্ত কিছুর মধ্যে ছিল রঙের আর স্কুল-স্কুল গন্ধ। তার কথায়, বড়রা যা যা করে, আজকাল ছোটরা তাদের খেলায় কেবল তারই নকল করে থাকে।

আসল 'আলাদিনের প্রদীপে' এবং আরও দুটো দোকানে গিয়েছিল, কিন্তু কোন লাভ হয় নি।

বিবরণ শেষ করে সে রাতের খাবারের আয়োজন করল। খেয়েদেয়ে এক গেলাস কড়া কফি পান করার পর লংগ্রেন বলল:

"আমাদের ভাগ্য যখন মন্দ, তখন খুঁজে দেখা দরকার। আমি হয়ত আবার 'ফিট্‌সরয়' কিংবা 'পালের্মো' জাহাজে কাজ নেব। ওরা অবশ্য ঠিকই বলেছে," খেলনাগুলোর কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কভাবে সে বলল। "এখন বাচ্চারা খেলে না, শেখে। ওরা কেবল শেখে আর শেখে, কিন্তু জীবন ওদের কখনই শুরু হবে না। ব্যাপারটা তা-ই বটে, দুঃখের কথা, সত্যিই দুঃখের কথা। একটা জাহাজ-যাত্রার সময় আমাকে ছাড়া তুই থাকতে পারবি ত? তোকে একা যে কী করে রেখে যাব ভেবে পাই না।"

"আমিও তোমার সঙ্গে কাজ করতে যেতে পারি, এই ধর না কেন জাহাজের খাবার ঘরে কাজ করতে পারি।"

"না!" লংগ্রেন টেবিলের ওপর হাত চাপড়ে, টেবিল কাঁপিয়ে কথাটার ওপর ইতি টেনে দিল। "আমি বেঁচে থাকতে তোর চাকরী করা চলবে না। সে যাক গে, ভাবার এখনও সময় আছে।"

সে ভুরু কুঁচকে চুপ করে রইল। আসল টুলের কোনায় তার পাশে গিয়ে বসল। লংগ্রেন ঘাড় না ফিরিয়ে আড়চোখে দেখল যে সে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছে, এতে তার প্রায় হাসিই পেয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সে নিজে যদি হাসে তাহলে মেয়ে ভয় পেয়ে যাবে, বিব্রত বোধ করবে। আসল নিজের মনে বিড়বিড় করতে করতে বাপের জট পাকানো সাদা দাড়িতে হাত বুলাল, তার গোঁফে চুমু দিল, সরু সরু আঙুল দিয়ে বাপের লোমশ কান দুটো বন্ধ করে বলল:

"এই ত এবারে তুমি আর শুনতে পারবে না যে আমি তোমাকে ভালোবাসি।"

যতক্ষণ না মেয়ে তাকে চাঙ্গা করে তুলল ততক্ষণ লংগ্রেন জোর করে চোখমুখ কুঁচকে বসে রইল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন ধোঁয়ায় নিশ্বাস নিতে ভয় পাচ্ছে। কিন্তু মেয়ের কথা শুনতে পেয়ে সে ভারী গলায় হো হো করে হেসে উঠল।

"আমার লক্ষ্মী মেয়েটা," কেবল এই কথাটা বলে মেয়ের গালে মৃদু চাপড় দিয়ে সে সমুদ্রের ধারে গেল নৌকো দেখতে।

আসল কিছুক্ষণ চিন্তাচ্ছন্ন ভাবে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল; শান্ত বিষণ্ণতার মধ্যে আত্মসমর্পণের বাসনা এবং ঘরের কাজে মনোযোগের আবশ্যকতা তাকে দ্বিধাগ্রস্ত করে ফেলল; অতঃপর বাসন ধোয়ার পর আলমারিতে আর কতটা খাবারের সংস্থান আছে দেখে নিল। সে ওজন না করে এবং না মেপেই দেখতে পেল যে ময়দা যতটা আছে তাতে টেনেটুনে সপ্তাহের শেষ অবধি চালানো যাবে না; চিনির কৌটোয় তলাটা চোখে পড়েছে; চা আর কফির মোড়ক প্রায় খালি; মাখন নেই; একমাত্র ব্যতিক্রম যেটা এবং যার ওপর কতকটা বিরক্তির সঙ্গে তার চোখ এসে ঠেকল তা হল আলুর বস্তা। এর পর সে মেঝে ধোয়ামোছা করল, পুরনো কাপড় কেটে স্কার্টের ঝালর তৈরি করতে বসল; কিন্তু কাটা কাপড়ের টুকরোগুলো আয়নার পেছনে আছে মনে পড়ে যেতেই সে আয়নার দিকে এগিয়ে গিয়ে মোড়কটা তুলে নিল; তারপর আয়নায় নিজের ছায়ার ওপর চোখ বুলাল।

আখরোট কাঠের ফ্রেমের ভেতরে, প্রতিফলিত ঘরের উজ্জ্বল শূন্যতার মধ্যে দাঁড়িয়েছিল

 গোলাপী ফুলের ছাপ দেওয়া সস্তার সাদা মসলিনের পোশাক পরনে ছোটখাটো পাতলা গড়নের এক তরুণী। তার কাঁধে একটা ছাইরঙা রেশমী রুমাল। রোদের তাতে অল্প পোড়া আধা শিশুসুলভ মুখটি ছিল প্রাণচঞ্চল ও ভাবব্যঞ্জক; তার বয়সের পক্ষে খানিকটা গাম্ভীর্যপূর্ণ, সুন্দর চোখের দৃষ্টিতে ছিল গভীর হৃদয় থেকে উৎসারিত ভীরু একাগ্রতা। তার রীতিবিরুদ্ধ মুখ মার্জিত সূক্ষ্ম রেখাগুলির জন্য লোকের মনকে স্পর্শ করতে পারত; এই মুখের প্রতিটি বাঁকা টান, প্রতিটি স্ফীতি অবশ্যই অসংখ্য নারীর চেহারায় স্থান পেতে পারত, কিন্তু সমস্তটা মিলে তার রীতি ছিল মৌলিক — মৌলিক মাধুর্যপূর্ণ। এখানেই আমরা ক্ষান্ত হব। বাকিটা ভাষার অতীত, কেবল 'মুগ্ধকর' শব্দটি ছাড়া।

প্রতিবিম্বের মেয়েটি হাসল, আসলের মতোই সহজ প্রবৃত্তির বশে হাসল। হাসিটা হল বিষণ্ণ; তা লক্ষ করে সে বিব্রত বোধ করল, যেমন হয় বাইরের কোন লোককে দেখলে। সে আয়নার গায়ে গাল ঠেকিয়ে চোখ বুজল, যেখানে তার ছায়া পড়েছিল আয়নার সে জায়গাটায় মৃদু হাত বুলাল। এক ঝাঁক ভাসা ভাসা মধুর চিন্তা তার ভেতরে খেলে গেল; সে শরীর সোজা করল, হেসে উঠল, সেলাই নিয়ে বসল।

যতক্ষণ সে সেলাই করছে ততক্ষণ আরও কাছ থেকে তাকে লক্ষ করা যাক — তার ভেতরটা লক্ষ করা যাক। তার ভেতরে দুটি তরুণী, দুটি আসল এক অপূর্ব, সুন্দর, রীতিবিরুদ্ধ রূপের মধ্যে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। একটি ছিল খেলনার কারিগর, হস্তশিল্পী নাবিকের মেয়ে, অন্যটি — জীবন্ত কবিতা, তার সুরসমন্বয় ও রূপের যাবতীয় চমৎকারিত্ব, এক শব্দ থেকে অন্য শব্দের উপর আলো আর ছায়া পাতের পারস্পরিক সমস্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সমেত শব্দমালার রহস্যময় সহাবস্থান। সে তার নিজের অভিজ্ঞতার সীমানার মধ্যে জীবনকে জানত, কিন্তু সামগ্রিক ব্যাপার ছাড়া অন্য প্রকৃতির প্রতিফলিত অর্থও সে দেখতে পেয়েছে। এই ভাবে, বস্তুকে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে আমরা তার মধ্যে এমন একটা কিছু দেখি যা রৈখিক নয়; আমরা দেখি মনে যে ছাপ পড়ে তার মাধ্যমে— বিশেষত মানবিক এবং—মানবিক মাত্রেই যেমন হয়—বিচিত্রধর্মী। এই দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমরা যা বললাম (অবশ্য যদি সফলভাবে বলে থাকি) অনেকটা সে রকমই কিছু একটা সে দেখতে পায় প্রত্যক্ষেরও উপরে। এই নীরব সাফল্য অর্জন ছাড়া অনায়াসবোধ্য কোন জিনিসই তার হৃদয় গ্রহণ করতে পারত না। সে পড়তে জানত, পড়তে ভালোও বাসত, কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি বইয়ের মধ্যেও সে প্রধানত অনুধাবন করতে ভালোবাসত গূঢ়ার্থ। নিজের অজ্ঞাতে, এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রেরণার বশে সে পদে পদে অসংখ্য এমন সমস্ত সূক্ষ্ম বায়বীয় আবিষ্কার করে যেগুলি অনির্বচনীয় অথচ পরিচ্ছন্নতা ও উষ্ণতার মতোই গুরুত্বপূর্ণ। কখনও কখনও—আর এটা চলত বেশ কয়েক দিন ধরে—তার যেন পুনর্জন্ম হত; জ্যার টঙ্কারে নিস্তব্ধতা ভঙ্গের মতো জীবনের প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ত, আর সে যা কিছু দেখত, যা নিয়ে তার জীবন, চার পাশে যা যা থাকত, সে সমস্তই প্রাত্যহিকতার রূপের মধ্যে রহস্যের আল্পনা হয়ে দাঁড়াত। বহু বার এমন হয়েছে যে উদ্বেগ ও শঙ্কা মনে জাগতে রাতের বেলায় সে সমুদ্রতীরে গিয়েছে, রীতিমতো গুরুত্ব দিয়ে রাঙা পালতোলা জাহাজের সন্ধান করতে করতে ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে। এই মুহূর্তগুলি তার কাছে সুখের ছিল। আমাদের

পক্ষে এই ভাবে রূপকথায় নিজেকে সমর্পণ করা কঠিন; তেমনি রূপকথার ক্ষমতা ও আকর্ষণ থেকে তার পক্ষে বেরিয়ে আসাও কোন অংশে কম কঠিন নয়।

আবার কখনও এই সমস্ত কথা চিন্তা করে নিজের কাছে নিজেকে সত্যি সত্যি আশ্চর্যের ঠেকে, যা বিশ্বাস করেছিল তাকে সে বিশ্বাস করতে পারে না; হেসে সমুদ্রকে ক্ষমা করে এবং বিষণ্ণ মনে বাস্তবে ফিরে আসতে আসতে, আর এখন ঝালরটা নাড়াচাড়া করতে করতে বালিকার মনে পড়ে যায় তার নিজের জীবনের কথা। সেখানে ছিল অনেক একঘেয়ে আর সাদামাঠা ব্যাপার। দুজনের নিঃসঙ্গ জীবন সময় সময় তার কাছে দারুণ অসহ্য মনে হয়, কিন্তু ইতিমধ্যেই তার ভেতরে গড়ে উঠেছে অভ্যন্তরীণ ভীরুতার এমন ভাঁজ, দুঃখভোগজনিত এমন বলিরেখা যা প্রাণচাঞ্চল্য সঞ্চারের এবং গ্রহণের অন্তরায়। তাকে দেখে লোকে মুখ টিপে হাসত, বলত: "ছিটগ্রস্ত", "খাপছাড়া"। এই সব জ্বালা তার গা সওয়া হয়ে গেছে। মেয়েটিকে অপমানও সহ্য করতে হত, কিন্তু সে অপমানের ফলে আঘাতে যেন তার বুক ভেঙ্গে যেত। নারী হিশেবে কাপের্ণায় তার জনপ্রিয়তা ছিল না, কিন্তু অনেকেই ভাসা-ভাসা এবং বন্য দৃষ্টিতে হলেও সন্দেহ করত যে অন্যদের চেয়ে তার অনেক জিনিস বেশি আছে — অবশ্য অন্য ভাষায়। যাদের গায়ের চামড়া তেল চকচকে, পায়ের গোছা মোটা আর হাতে শক্তি আছে, এই রকম ঠাসবুনোনি চেহারার, ভারী নারীরা কাপের্ণার পুরুষদের কাছে সমাদর পেত; এখানে ভাবসাব করার ধরনটা ছিল পিঠে থাবড়া মেরে কিংবা বাজার এলাকায় ভিড়ের মধ্যে লোকে যে রকম করে সেই ভাবে ধাক্কা দিয়ে। এই অনুভূতির ধরনটা গর্জনের মতোই অকপট সরল। এই স্থিরপ্রতিজ্ঞ পরিমণ্ডলীর মধ্যে' আসল ঠিক তেমনই খাপ খেত, যেমন খাপ খেতে পারত উচ্চ স্নায়ুতন্ত্রী-সম্পন্ন মানুষের সঙ্গে প্রেতাত্মার সমাজ — তা আসুন্তা বা আস্পাসিয়ার যত মনোহারিত্বই সে-প্রেতাত্মার থাক না কেন। যাকে ঠিক ভালোবাসা বলে এখানে তার কোন প্রশ্নই আসতে পারে না। এই ভাবে, ফৌজী বিউগলের টানা ভেঁপুর মধ্যে বেহালার মধুর করুণ সুর দুর্ধর্ষ রেজিমেন্টকে তার নির্দিষ্ট কার্যকলাপ থেকে টলাতে অক্ষম। তাছাড়া এখানে যে সমস্ত কথা বলা হত মেয়েটি তার দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে থাকত।

তার মাথায় যখন জীবনের সঙ্গীত গুনগুন করছিল তখন তার ছোট ছোট হাত দুটো যত্নের সঙ্গে চটপট কাজ করে চলছিল; দাঁত দিয়ে একটা সুতো কেটে সে নিজের সামনের দিকে বহুদূরে দৃষ্টি প্রসার করল, কিন্তু তাতে সমান করে কোনা মুড়তে এবং সেলাই কলের মতো নিখুঁত ভাবে ফোঁড় দিতে তার কোন অসুবিধা হচ্ছিল না। লংগ্রেন ফিরে না এলেও বাবার জন্য সে উদ্বেগ বোধ করল না। আজকাল লংগ্রেন বেশ ঘন ঘন রাতের বেলায় নৌকোয় চেপে মাছ ধরতে কিংবা নেহাৎই হাওয়া খেতে বেরোয়।

শঙ্কা তাকে দংশন করত না; সে জানত যে খারাপ কিছু লংগ্রেনের হবে না। এদিক থেকে আসল এখনও একটা ছোট মেয়ে, যে নিজের মতো করে অমায়িক ভঙ্গিতে গদগদ কণ্ঠে সকালে আওড়ায়: "প্রণাম তোমাকে, ভগবান!" আর সন্ধ্যায় — "বিদায় জানাই ভগবান!"

আসলের মতে, ঈশ্বর যাতে বিপদ থেকে তাদের রক্ষা করেন তার জন্য ঈশ্বরের সঙ্গে

 এরকম সংক্ষিপ্ত পরিচিতিই যথেষ্ট। আসল ঈশ্বরের পরিস্থিতিতে নিজেকে কল্পনা করেও দেখেছে: ঈশ্বর কোটি কোটি মানুষের নানা কাজ নিয়ে সদা ব্যস্ত, তাই আসলের মতে, জীবনের তুচ্ছ প্রাত্যহিক ছায়াগুলিকে বিনম্র ধৈর্যের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে সেই অতিথির মতন যে নিমন্ত্রণ বাড়িতে ভিড় দেখে গৃহকর্তার জন্য অপেক্ষা করে, পরিস্থিতি অনুযায়ী যতটা সম্ভব নিজের আশ্রয় ও খাদ্যের ব্যবস্থা করে নেয়।

সেলাই শেষ করে আসল কোনার ছোট টেবিলে কাজটা রেখে দিয়ে পোশাক ছেড়ে শুয়ে পড়ল। বাতি নিভিয়ে দিল। শিগগিরই সে লক্ষ করল যে তন্দ্রাবেশ তার নেই; চেতনা ছিল স্পষ্ট, যেমন হয়ে থাকে দিনে দুপুরে। এমন কি অন্ধকারও যেন কৃত্রিম মনে হচ্ছিল; চেতনার মতো দেহও মনে হচ্ছিল হালকা, দিবাসুলভ। হৃৎপিণ্ড পকেট-ঘড়ির মতো দ্রুত স্পন্দিত হচ্ছিল; যেন টিকটিক করছিল বালিশ আর কানের মাঝখানে। আসলের বিরক্তি ধরে গেল, সে ছটফট করতে লাগল, কখনও গায়ের কম্বল ফেলে দেয়, কখনও বা আপাদমস্তক কম্বলে জড়ায়। অবশেষে তার পক্ষে মনে মনে কল্পনা করা সম্ভব হল অভ্যস্ত দৃশ্য, যা তাকে ঘুমিয়ে পড়তে সাহায্য করে: সে মনে মনে স্বচ্ছ জলে ঢিল ছুঁড়তে থাকে, মুগ্ধ হয়ে দেখে মৃদু তরঙ্গের ক্রম প্রসারিত বৃত্তমালা। নিদ্রা যেন ঠিক এই জিনিসটাই চাইছিল। নিদ্রা এলো, আসলের শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকা মেরীর সঙ্গে কানাকানি করল এবং তার হাসির আজ্ঞানুবর্তী হয়ে চার দিকে সর্বত্র বলল: "শ্-শ্-শ্।" আসল তৎক্ষণাৎ ঘুমিয়ে পড়ল। সে দেখল তার প্রিয় স্বপ্ন: মুকুলিত গাছপালা, একটা আকুলতা, যাদুকরী আকর্ষণ, সঙ্গীত ও রহস্যময় ঘটনা, আর জেগে ওঠার পর সেগুলির মধ্য থেকে সে মনে করতে পারল কেবল পা থেকে হৃৎপিণ্ডের দিকে প্রবাহিত নীল সমুদ্রের ঝলক, শিরশিরে ঠাণ্ডা আর পুলকের অনুভূতি। এসব দেখার পর সে আরও কিছুটা সময় অসম্ভবের দেশে কাটাল, তারপর ঘুম ভাঙতে উঠে বসল।

ঘুম বলতে যা বোঝায় তা হয় নি, মনে হচ্ছিল যেন সে মোটেই ঘুমোয় নি। একটা নূতনত্ব ও আনন্দের অনুভূতি, কোন একটা কিছু করার বাসনা তাকে উত্তেজিত করে তুলছিল। সে এমন দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাতে লাগল যেন কোন নতুন ঘর নিরীক্ষণ করছে। প্রভাত এসে প্রবেশ করল — আলোকের সমস্ত স্পষ্টতা নিয়ে নয়, এমন এক অস্পষ্ট প্রয়াস নিয়ে যার মধ্যে পারিপার্শ্বিককে চেনা যেতে পারে। জানলার নীচের দিক কালো; ওপরের অংশ আলোকোজ্জ্বল। বাড়ির বাইরে, জানলার ফ্রেমের প্রান্তভাগে ঝিকমিক করছে শুকতারা। এখন আর ঘুম হবে না জেনে পোশাক পরে আসল জানলার দিকে গেল, ছিটকিনি খুলে জানলার পাল্লা সরিয়ে দিল। জানলার বাইরে ছিল গভীর মনোযোগী, নিখুঁত নিস্তব্ধতা; সে নিস্তব্ধতা যেন নেমে এসেছে এই মাত্র। নীল আলো-আঁধারির মধ্যে চিকচিক করছে ঝোপঝাড়; খানিকটা দূরে ঘুমিয়ে ছিল গাছপালা; বাতাসে গুমসানি আর সোঁদা-সোঁদা গন্ধ।

জানলার চৌকাটের ওপরের অংশে হাত রেখে তরুণী বাইরে তাকিয়ে দেখল, হাসল। অকস্মাৎ দূরের আহ্বানের মতো কিছু একটা তার ভেতরে ও বাইরে নাড়া দিয়ে উঠল, তাতে সে যেন আরও একবার প্রত্যক্ষ বাস্তব থেকে জেগে উঠল আরও প্রত্যক্ষ, আরও সন্দেহাতীতের জগতে। এই মুহূর্ত থেকে চেতনার আনন্দোচ্ছল সম্পদ তার সঙ্গী হয়ে

থাকল। এই ভাবে, অনুধাবন করার সময়, আমরা মানুষের কথা শুনি, কিন্তু যা বলা হয়েছে তার যদি পুনরাবৃত্তি করতে হয় তাহলে তাকে আরও একবার অনুধাবন করতে পারব অন্য এক অর্থে, নতুন অর্থে। এমনই ঘটেছিল তার ক্ষেত্রে।

সে মাথার রুমালটা তুলে নিল। রেশমী রুমালটা পুরনো হলেও তার মাথায় সব সময় নতুন মনে হত। সেটাকে সে এক হাতে মুঠো করে ধরে চিবুকের নীচে ধরে দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে এক লাফে খালি পায়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। চার দিকে খালি আর নির্জন-নির্জন হলেও তার মনে হচ্ছিল সে যেন অর্কেস্ট্রার মতো ধ্বনি তুলছে, যেন লোকে তাকে শুনে ফেলতে পারে। সবই তার ভালো লাগছিল, তাকে আনন্দ দিচ্ছিল। ঈষদুষ্ণ ধুলোমাটি তার খালি পায়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছিল; নির্মল বাতাসে নিশ্বাস নিতে খুশি খুশি লাগছিল। ভোরের আকাশের অস্পষ্ট আলোয় ঘরবাড়ির ছাদ আর মেঘের খন্ড কালো কালো দেখাচ্ছিল। বাগান, বেড়া, বনগোলাপের ঝোপ, সবজি বাগান আর ঈষৎ দৃষ্টিগোচর পথরেখা তন্দ্রায় আচ্ছন্ন। সব কিছুর মধ্যে লক্ষ করা যাচ্ছিল এমন একটা ব্যবস্থা যা দিনের চেয়ে অন্য রকমের — সেই একই, অথচ সঙ্গতিপূর্ণ, যে-সঙ্গতি আগে চোখ এড়িয়ে গেছে। সবই ঘুমিয়ে ছিল খোলা চোখে, পাশ দিয়ে যে তরুণীটি চলেছে তাকে গোপনে নিরীক্ষণ করছিল।

সে যত দূরে যেতে থাকে ততই বাড়াতে থাকে পায়ের গতি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গাঁ ছাড়ার চেষ্টা করে। কাপের্ণা ছাড়ানোর পর পড়ল বিস্তীর্ণ তৃণভূমি; তৃণভূমির পর তীরের টিলার ঢালু ছেয়ে গেছে বাদামের ঝাড়, পপলার আর বড় বড় বাদাম গাছ। রাস্তা যেখানে শেষ হয়ে গিয়ে শুরু হয়েছে ঝোপঝাড়ে ঢাকা পায়ে-চলা-পথ সেখানে আসলের পায়ের কাছে ঘুরঘুর করতে লাগল ফুঁয়োফুঁয়ো লোমওয়ালা একটা কালো কুকুর। কুকুরটার বুকের অংশ সাদা রঙের, তার উৎকণ্ঠিত চোখ দুটো যেন কথা বলছিল। আসলকে চিনতে পেরে সে থেকে থেকে কিঁউ কিঁউ করতে করতে ঢঙ করে শরীর দোলাতে দোলাতে নীরবে তার সঙ্গে 'আমি-তুমি' গোছের কোন এক পরিষ্কার বোঝাপড়ার ভাব নিয়ে পাশাপাশি চলতে লাগল। কুকুরটার আলাপী চোখের দিকে তাকিয়ে আসলের দৃঢ় বিশ্বাস হল এই যে চুপ করে থাকার রহস্যজনক কোন কারণ না থাকলে সে নির্ঘাত কথা বলত। সঙ্গিনীর হাসি লক্ষ করে কুকুরটা খুশি হয়ে চোখমুখ কোঁচকাল, লেজ নাড়াতে নাড়াতে সোজা সামনের দিকে ছুটতে লাগল, কিন্তু হঠাৎ উদাসীন ভঙ্গিতে বসে পড়ল, ব্যস্তসমস্ত হয়ে থাবা দিয়ে চুলকে নিল তার চিরশত্রুর কামড়ে ক্ষতবিক্ষত কানটি, তারপর ছুট দিল উলটো দিকে।

আসল প্রবেশ করল শিশিরবিন্দু ছিটানো তৃণভূমির লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে। করতল নীচের দিকে করে ঘাসের ঝাড়ুর ওপর হাত রেখে প্রবহমান স্পর্শ নিতে নিতে সে হাসতে হাসতে চলল। ফুলের বিশেষ বিশেষ মুখ, কান্ডের জট খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে তাদের মধ্যে সে আলাদা আলাদা করে চিনতে পারে মানুষের রূপের আভাস—ভঙ্গি, প্রয়াস, চালচলন, আকৃতি ও দৃষ্টি। এখন যদি কাঁটাচুয়াদের স্থূল আমোদপ্রমোদের ফরফর আওয়াজ ঘুমন্ত বনদেবতাকে চমকে দেয় কিংবা যদি মেঠো ইঁদুরদের মিছিল বা ছুঁচোদের নাচ দেখা যায় তাহলে সে আশ্চর্য হবে না। আর ঠিকই ছাইরঙা একটা কাঁটাচুয়া গড়িয়ে

 পড়ল তার সামনে পায়ে-চলা পথের ওপর। কাঁটাচুয়াটা রেগে কাটা কাটা ফর্-র ফর্-র আওয়াজ ছাড়ল, যেমন পথচারির উদ্দেশে করে থাকে গাড়োয়ান। আসল যাদের বুঝতে পারে এবং দেখতে পায় তাদের সঙ্গে কথা বলে। "কেমন আছ রোগী?" পোকায় ঝাঁঝরা বেগনী-নীল রঙের ইরিসের উদ্দেশে আসল বলল। পায়ে-চলা পথের মাঝখানে পড়ায় একটা ঝোপ পথচারিদের পোশাকের গায়ে লেগে লেগে পাতা হারিয়ে হতশ্রী হয়ে পড়েছিল, তার উদ্দেশে আসল বলল, "একটু বাড়িতে বসে থাকা দরকার।" একটা বড় কাচপোকা একটা ঘণ্টাফুলকে আঁকড়ে ঝুলছিল, তাতে ফুলটা ঝুলে পড়ছিল, কিন্তু পোকাটাও পিছলে পড়তে পড়তে জিদ করে পা ঠেলে ঠেলে ওপরে উঠে আসছিল। "মোটা যাত্রীটাকে ঝেড়ে ফেলে দাও," আসল পরামর্শ দিল। কাচপোকাটা যেন সত্যি সত্যিই আর সামলাতে না পেরে একপাশে ছিটকে পড়ে গেল। এই ভাবে উদ্বেগের মধ্যে, দুরুদুরু বুকে, আবেগে উদ্দীপিত অবস্থায় সে এগিয়ে গেল টিলার ঢালের দিকে। বিস্তীর্ণ তৃণভূমি থেকে সে ঝোপঝাড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল, কিন্তু তার চারধারে এখন আছে তার নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব, যারা — সে জানত — কথা বলে খাদের গলায়।

এখানে লতাপাতা আর বাদামের ঝোপঝাড়ের মাঝখানে ছিল বিশাল বিশাল পুরনো গাছপালা। তাদের ঝুলন্ত শাখাপ্রশাখা ঝোপঝাড়ের ওপরের পাতাগুলি স্পর্শ করছিল। চেস্টনাট গাছের শান্ত ভঙ্গিতে নুয়ে পড়া বড় বড় পাতার রাশির মধ্যে খাড়া হয়ে ছিল শীষ, তাদের সুবাস শিশির আর রজনের গন্ধের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছিল। পায়ে-চলা পথটা পিছল শিকড়-বাকড়ের উদ্‌গত অংশে ছেয়ে আছে, কখনও ঢালু বয়ে নীচে নেমেছে কখনও বা উপরে উঠে গেছে। আসল এখানে বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করছিল। গাছপালার সঙ্গে সে সম্ভাষণ করল, যেমন করে থাকে মানুষের সঙ্গে, অর্থাৎ সম্ভাষণ করল তাদের চওড়া পাতাগুলি চেপে ধরে। সে চলতে চলতে কখনও মনে মনে কখনও বা সশব্দে ফিসফিস করে বলতে থাকে: "এই যে তুমি, এই যে আরও একজন তুমি; তোমরা যে অনেক ভাই! আমি চলছি তাই, আমার তাড়া আছে, আমাকে ছেড়ে দাও! আমি তোমাদের সবাইকে চিনতে পারছি, সবাইকে আমি মনে রেখেছি, ভক্তিও করি।" 'ভাইরা'ও জমকাল ভঙ্গিতে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়, যে যেমন ভাবে পারল: তাদের পাতা দিয়ে, আর ক্যাঁচকোঁচ-মসমস আওয়াজ করে জবাব দেয়, যেন তারা ওর পরমাত্মীয়। সে কাদামাখা পা নিয়ে সমুদ্রের ওপরে খাড়া পাড়ের দিকে চলল, তাড়াতাড়ি হাঁটার ফলে ঘন ঘন নিশ্বাস নিতে নিতে সে উঠে দাঁড়াল পাড়ের কিনারায়। একটা গভীর, অদম্য বিশ্বাস তার ভেতরে ভেতরে উল্লসিত হয়ে টগবগ করছিল। সে তাকে দৃষ্টি দিয়ে দিগন্তের ওপারে ছুঁড়ে দিল, আর সেখান থেকে তা তটস্থ তরঙ্গভঙ্গের মৃদু শব্দ নিয়ে ফিরে আসতে লাগল পরিচ্ছন্ন গতির জন্য গর্বিত ভঙ্গিতে। দিগন্তে সোনালি সুতো জড়িয়ে সমুদ্র তখনও ঘুমিয়ে আছে; কেবল খাড়া পাড়ের নীচে, তটস্থ গহ্বরের জলকাদার মধ্যে জল উঠছে আর পড়ছে। উপকূলের কাছাকাছি ঘুমন্ত সাগরের ইস্পাত রং নীল ও কালো হয়ে আসতে লাগল। সোনালি সুতোর ওপারে আকাশ দপ করে জ্বলে উঠে আলোর বিশাল পাথার মতো দীপ্তি পেতে থাকে; সাদা মেঘরাশির গায়ে হালকা গোলাপী রঙ ধরে। মেঘের মধ্যে জ্বলজ্বল করে সূক্ষ্ম স্বর্গীয় জ্যোতি। কালো রঙের দূর প্রান্তে ইতিমধ্যে লেগেছে কাঁপা

কাঁপা তুষার-শুভ্র আভা; ফেনা ঝকঝক করছিল, আর সোনালি সুতোর মাঝবরাবর রক্তিম আলোকোচ্ছ্বাস ফেটে পড়ে সমুদ্র বয়ে আসলের পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিচ্ছে রক্তবর্ণের লহরী।

আসল পা গুটিয়ে দু হাতে হাঁটু জড়িয়ে বসল। সে সমুদ্রের দিকে ঝুঁকে পড়ে বড় বড় চোখ মেলে মন দিয়ে দিগন্ত দেখতে লাগল। তার চোখে তখন বয়স্কের কোন ভাব ছিল না—সে চোখ ছিল শিশুর চোখ। এতক্ষণ উত্তেজিত হয়ে সে যা কিছুর প্রতীক্ষা করছিল তা যেন সংঘটিত হচ্ছিল ওখানে—জগতের শেষ প্রান্তে। গভীর সমুদ্রের দূর দেশে সে দেখতে পেল মগ্নশৈল; তার পৃষ্ঠদেশ থেকে ঊর্ধ্বমুখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে লতানে গাছপালা; তাদের গোল গোল পাতার রাশির প্রান্তদেশ ভেদ করে বেরিয়েছে কান্ড, সে সমস্ত পাতার মাঝখানে চকচক করছে অদ্ভুত অদ্ভুত ফুল। ওপরের পাতাগুলি ঝলক দিচ্ছিল সাগরের বুকে; আসল যা জানত তার বিন্দুবিসর্গ যে লোকের জানা ছিল না সে দেখতে পেত কেবল শিহরন আর ঝলক।

ঘন ঝোপের ভেতর থেকে উঠে এলো জাহাজ; জাহাজটা ভেসে উঠে থেমে দাঁড়াল প্রভাত-আলোকের ঠিক মাঝখানে। এই দূরত্ব থেকে তাকে দেখাচ্ছিল মেঘের মতো স্পষ্ট। আনন্দের কণা ছুঁড়তে ছুঁড়তে জাহাজ দীপ্তি পাচ্ছে সুরার মতো, গোলাপের মতো, রক্তের মতো, ঠোঁটজোড়ার মতো, রক্তিম মখমল আর টকটকে লাল ফুলের মতো। জাহাজ চলেছে সোজা আসলের দিকে। জাহাজের তলদেশের প্রচন্ড চাপে পড়ে দু ধারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে দুই ডানার মতো ফেনার রাশি। এবারে তরুণী উঠে দাঁড়িয়ে দুহাত বুকে চেপে ধরতেই আলোর খেলা পরিণত হল ঊর্মিমালায়; সূর্য উঠল। ঘুমন্ত ধরণীর ওপর যা যা তখনও আরাম করে হাত-পা ছড়িয়ে ছিল সে সবেরই গা থেকে আবরণ টেনে তুলে নিল ভোরের উজ্জ্বল পরিপূর্ণতা।

তরুণী দীর্ঘশ্বাস ফেলে চারদিকে তাকাল। সঙ্গীত থেমে গেলেও আসল তখন পর্যন্ত তার সুরেলা ঐকতানে আচ্ছন্ন। এই অনুভূতিটি ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসতে আসতে পরে পরিণত হল স্মৃতিতে এবং অবশেষে শ্রান্তিতে। সে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল, হাই তুলল এবং পরম সুখাবেশে চোখ বুজে ঢলে পড়ল ঘুমে—সত্যিকারের ঘুমে, যে ঘুম হল কাঁচা বাদামের মতো শক্ত, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাহীন, স্বপ্নবিহীন।

তার খালি পায়ের তলায় মাছি ঘুরঘুর করছিল, তাতে তার ঘুম ভেঙে গেল। আসল জেগে উঠে অস্থির হয়ে পা ছুঁড়ল; উঠে বসে পড়ে অবিন্যস্ত চুলের রাশি কাঁটা দিয়ে সে গুছিয়ে ঠিকঠাক করতে লাগল, ফলে গ্রের আঙটি সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে গেল, কিন্তু ওটাকে নিছকই দু আঙুলের ফাঁকে একটা ঘাসের ডাঁটা বেধে গেছে ভেবে সে আঙুল ছড়িয়ে টানটান করল, কিন্তু তাতেও বাধা অপসারিত না হতে সে অধীর আগ্রহে হাতটা চোখের সামনে নিয়ে এলো, আর সঙ্গে সঙ্গে ফোয়ারার ফিনকির মতো প্রচন্ড বেগে লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

তার আঙুলে ঝিকমিক করছিল গ্রের আঙটি। আঙটিটা রশ্মি বিকিরণ করছিল, আর দেখে মনে হচ্ছিল যেন শোভা পাচ্ছে অন্য কারও আঙুলে—আঙুলটাকে এই মুহূর্তে সে নিজের বলে স্বীকার করতে পারছিল না, নিজের আঙুলকে সে অনুভব করতে পারছিল

 না। "এটা কার রসিকতা? জিনিসটা কার?" আসল তীব্র চিৎকার করে বলল। "আমি কি ঘুমুচ্ছি? এমনও ত হতে পারে যে কোন এক সময় পেয়েছিলাম, পরে ভুলে গেছি?" আঙটি ছিল তার ডান হাতের আঙুলে। বাঁ হাত দিয়ে ডান হাত আঁকড়ে ধরে আশ্চর্য হয়ে সে দৃষ্টি দিয়ে সমুদ্র আর ঘন সবুজ ঝোপ অনুসন্ধান করতে লাগল; কিন্তু ঝোপঝাড়ের মধ্যে কেউ নড়ে চড়ে উঠল না, কেউ সেখানে লুকিয়ে ছিল না, আর বহুদূর পর্যন্ত আলোকোদ্ভাসিত নীল সমুদ্রেও কোন রকম চিহ্ন ছিল না। আসলের চোখেমুখে তখন একটা গোলাপী আভা খেলে গেল, আর তার মন যেন উচ্চারণ করে বসল এক দিব্যবাণী— "হ্যাঁ।" ঘটনার কোন ব্যাখ্যা ছিল না, কিন্তু কথা আর চিন্তা ছাড়াই নিজের অদ্ভুত অনুভূতির মধ্যে তার স্বাদ পাচ্ছিল, তাই আঙটিটাও এখন হয়ে উঠল তার আপন। তার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল, সে এক টানে আঙটিটা আঙুল থেকে খুলে ফেলে জলের মতো অঞ্জলিবদ্ধ করে ধরে নিরীক্ষণ করল — সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে, যৌবনের সমস্ত উল্লাস আর সুস্পষ্ট অন্ধবিশ্বাস নিয়ে — তার পর কাঁচুলির ভেতরে লুকিয়ে রেখে আসল যখন করতলে মুখ ঢাকল তখন আড়াল থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল তার অসংযত হাসি। সে মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে ফিরতি পথ ধরল।

এই ভাবে, দৈবাৎ — পড়া-লেখা জানা লোকেরা যেমন বলে থাকে — অবশ্যম্ভাবিতায় পরিপূর্ণ এক গ্রীষ্মকালের সকালে গ্রে আর আসল পরস্পরকে খুঁজে পেল।

৫

যুদ্ধের প্রস্তুতি

'সিক্রেটের' ডেকে এসে ওঠার পর গ্রে কয়েক মিনিট স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, মাথার পেছন থেকে কপালে হাত বুলাতে লাগল। এটা তার নিদারুণ অপ্রস্তুত অবস্থার পরিচায়ক। একটা অন্যমনস্কতা — অনুভূতির মেঘাচ্ছন্ন চলাচল — তার মুখে ফুটিয়ে তুলল উন্মাদগ্রস্তের সংজ্ঞাহীন হাসি। তার সহকারী প্যাণ্টেন তখন কোয়ার্টার ডেকের ওপর দিয়ে ভাজা মাছের প্লেট নিয়ে আসছিল। গ্রেকে দেখতে পেয়ে সে ক্যাপ্টেনের অদ্ভুত মানসিক অবস্থা লক্ষ করল।

"আপনার কি কোন চোট লেগেছে?" সে সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করল। "কোথায় ছিলেন? কী দেখেছেন? অবশ্য সেটা আপনার ব্যাপার। এক দালালের কাছ থেকে লাভজনক শর্তে মাল চালানের অফার পাওয়া গেছে, অতিরিক্ত লাভের সুযোগ আছে। আরে, আপনার হল কী বলুন ত?.."

"ধন্যবাদ," বন্ধনমুক্ত লোকের মতো দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গ্রে বলল। "আপনার সহজ-সরল বুদ্ধিদীপ্ত কণ্ঠস্বর — ঠিক এটারই অভাব বোধ করছিলাম আমি। এ যেন ঠাণ্ডা জলের মতো। প্যাণ্টেন, জাহাজের সকলকে জানিয়ে দিন, আজ আমরা নোঙ্গর তুলছি, এখান

থেকে মাইল দশেক দূরে, লিলিয়ানার মোহানার দিকে চলছি। মোহানার স্রোত নিরেট ডুবন্ত চড়ায় বন্ধ হয়ে আছে। সেখানে ঢোকা যেতে পারে কেবল সমুদ্রের দিক থেকে। একবার এসে ম্যাপটা নিয়ে যাবেন। কর্ণধারকে নিয়ে কাজ নেই। আপাতত এই কথা রইল। হ্যাঁ, লাভজনক মাল চালানের অফারটা আমার ততটাই দরকার যেমন দরকার গত বছরের বরফ। দালালকে এটা জানিয়ে দিতে পারেন। আমি শহরে চললাম, সেখানে সন্ধ্যা অবধি থাকব।"

"কী হল কী বলুন ত?"

"কিছুই নয়, প্যান্টেন। আপনার অবগতির জন্য বলে রাখি, আমার ইচ্ছে হল সমস্ত রকম জিজ্ঞেসবাদ এড়িয়ে চলা। সময় হলে জানাব, ব্যাপার কী। নাবিকদের জানিয়ে দেবেন যে জাহাজ মেরামত করতে হবে, আর স্থানীয় ডকে এখনও কাজ চলছে।"

"ঠিক আছে। যা বললেন তা-ই হবে," হতবুদ্ধি প্যান্টেন প্রস্থানোদ্যত গ্রের পেছন দিক থেকে বলল।

ক্যাপ্টেনের হুকুম পুরোপুরি বোধগম্য হলেও মেট চোখ বড় বড় করে প্লেট হাতে নিয়ে অস্থির ভাবে নিজের কেবিনের দিকে ছুটতে ছুটতে বিড়বিড় করে বলল: "তোমার মাথাটা ঘুরিয়ে দিল, প্যান্টেন। ক্যাপ্টেন কি চোরাকারবারের তালে আছে নাকি? নাকি আমরা জলদস্যুদের কালো পতাকা ওড়াতে চলেছি?" কিন্তু এখানে নানা রকম উদ্ভট উদ্ভট অনুমান প্যান্টেনের বুদ্ধি বেমালুম গুলিয়ে দিল। সে যখন নার্ভাস হয়ে মাছ সাবাড় করে চলছিল ততক্ষণে গ্রে নিজের কেবিনে গিয়ে টাকা নিয়ে আসার পর খাড়ি পেরিয়ে লিসের দোকানপাটের তল্লাটে এসে হাজির হয়েছে।

এখন সে স্থির সংকল্প নিয়ে, শান্ত মনে কাজে নামল। এই অপূর্ব পথযাত্রায় যা যা করা দরকার তার সমস্ত খুঁটিনাটি সে জানত। প্রতিটি গতি — চিন্তা, ক্রিয়া তার মধ্যে সঞ্চার করে শিল্পকর্মের সূক্ষ্ম তৃপ্তিজনিত উত্তাপ। মুহূর্তের মধ্যে ছবির মতো স্পষ্ট হয়ে উঠল তার পরিকল্পনা। ছেনির শেষ আঘাতের পর মর্মর পাথরে যে রকম শান্ত, অপরূপ ঔজ্জ্বল্য দেখা যায়, তার জীবনবোধ সেই রকম এক রূপ অর্জন করল।

গ্রে তিনটি দোকানে ঘুরল। বাছাই যাতে নিখুঁত হয় সেই দিকে তার বিশেষ নজর ছিল, কেননা যে আভা ও রঙ তার দরকার তা সে ইতিমধ্যেই মনে মনে দেখতে পাচ্ছিল। প্রথম দুটি দোকানে তাকে দেখানো হল বাজারী রঙের রেশমী কাপড়, যার উদ্দেশ্য হল নেহাৎই অমার্জিত আত্মশ্লাঘার তৃপ্তিসাধন। তৃতীয় দোকানে সে জটিল ছাপ সৃষ্টির উপযোগী নমুনার সন্ধান পেল। দোকানের মালিক আনন্দে ডগমগ হয়ে ব্যস্তসমস্ত ভাবে তার পুরনো মজুত থেকে কাপড় বার করে সামনে ছড়িয়ে দিতে লাগল; কিন্তু গ্রে অঙ্গব্যবচ্ছেদকারীর মতো সিরিয়াস। সে ধৈর্য ধরে কাপড়ের মোড়কগুলি বাছাই করে চলল, আলাদা করে সরিয়ে রাখল, সরিয়ে একত্র করল, এত বেশি সংখ্যক লাল কাপড় সামনে খুলে সেগুলির রঙ্ দেখতে লাগল যে মনে হচ্ছিল কাপড়ে বোঝাই কাউণ্টার দপ্ করে জ্বলে উঠল বলে। গ্রের বুটের ডগায় খেলে যাচ্ছে ঘন লাল রঙের ঢেউ; তার হাত আর মুখ ঝকঝক করছে গোলাপী রঙের বিচ্ছুরণে। রেশমের মৃদু প্রতিবন্ধকতার মধ্যে

 হাতড়াতে হাতড়াতে সে লক্ষ করে চলছিল রঙ্: লাল, ফেকাসে গোলাপী, গাঢ় গোলাপী; ঘন টগবগে চেরি-রঙ্, কমলা আর গভীর লালচে বাদামী রঙ্। এখানে ছিল ক্ষমতায় ও তাৎপর্যে যত রকমের সম্ভব রঙের আভা; তারা তাদের কল্পিত আত্মীয়তার বিচারে "অপূর্ব", "জমকাল", "নিখুঁত" — এই শব্দগুলির মতোই বিভিন্ন ধরনের। ভাঁজে ভাঁজে সংগুপ্ত ছিল এমন সমস্ত ইঙ্গিত যেগুলি চোখের ভাষার অগম্য, কিন্তু খাঁটি রাঙা বর্ণ অনেকক্ষণ আমাদের ক্যাপ্টেনের চোখে ধরা পড়ল না; দোকানদার যা যা নিয়ে আসছিল তা ভালো হলেও স্পষ্ট ও দৃঢ় "হ্যাঁ" মুখ দিয়ে বার করতে পারল না। অবশেষে একটা রঙ্ ক্রেতার নিরস্ত্র মনোযোগ আকর্ষণ করল; সে জানলার লাগোয়া আরাম চেয়ারটাতে বসে পড়ল, খসখস আওয়াজ তুলে রেশমী কাপড়ের লম্বা প্রান্ত ধরে টেনে তুলে সেটাকে ধপ করে কোলের ওপর ফেলল, গা এলিয়ে দিয়ে দাঁতে পাইপ চেপে ধরে নিশ্চল হয়ে থেকে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল।

ভোরের আলোকধারার মতো সম্পূর্ণ খাঁটি, উদার আনন্দ ও রাজকীয় ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ এই রঙ্ ঠিক সেই দৃপ্ত রঙ্ যার খোঁজ গ্রে করছিল। তার মধ্যে আগুনের রঙ্ ও পপি ফুলের পাপড়ির মেশানো আভা ছিল না, বেগনী ও নীল-রক্তিমাভার খেলা ছিল না; নীলিমা বা ছায়া ছায়া ভাব বলে কিছু ছিল না — এমন কিছুই ছিল না যাতে সন্দেহ জাগতে পারে। সে রঙ্ আত্মার প্রতিচ্ছবির মাধুর্যে হাসির মতো ঝলমল করছিল। গ্রে এত আনমনা হয়ে পড়েছিল যে দোকানের মালিক যে শিকারী কুকুরের মতো উদ্‌গ্রীব হয়ে তার পেছনে ওত্ পেতে অপেক্ষা করছিল তা তার খেয়ালই ছিল না। অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে ব্যাপারী শেষকালে ফরফর শব্দে এক টুকরো কাপড় ছিঁড়ে নিজের অস্তিত্ব স্মরণ করিয়ে দিল।

"আর নমুনার দরকার নেই," গ্রে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, "এই রেশমী কাপড়টা আমি নিচ্ছি।"

"গোটা গাঁটটা?" দোকানদার সসম্ভ্রমে সন্দিগ্ধস্বরে জিজ্ঞেস করল। কিন্তু গ্রে নীরবে লোকটার কপালের দিকে তাকাতে সে খানিকটা গায়ে-পড়া হয়েই বলল, "তা হলে বলুন, কত মিটার?"

গ্রে তাকে মাথা নাড়িয়ে ইঙ্গিতে একটু অপেক্ষা করতে বলল, তার পর যতটা দরকার পেন্সিল দিয়ে কাগজের ওপর সেই সংখ্যাটা লিখল।

"দু হাজার মিটার।" সে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকগুলো নিরীক্ষণ করে দেখল। "হ্যাঁ দু হাজার মিটারের বেশি নয়।"

"দুই?" ছাড়া স্প্রিংয়ের মতো তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দোকানের মালিক বলল। "দু হাজার? মিটার? দয়া করে বসুন ক্যাপ্টেন। নতুন আমদানী কাপড়ের কিছু নমুনা দেখতে চান কি ক্যাপ্টেন? অবশ্য আপনার যেমন অভিরুচি। এই যে দেশলাই, এই যে চমৎকার তামাক, আসুন। দু হাজার ...এক মিটারের দাম হল গিয়ে..." সে এমন একটা দামের উল্লেখ করল যার সঙ্গে সত্যিকারের দামের খুব কমই সম্পর্ক আছে, যেমন সম্পর্ক থাকে সাধারণ "হ্যাঁ" উচ্চারণের সঙ্গে শপথবাক্য উচ্চারণের। কিন্তু গ্রে তাতেই সন্তুষ্ট, কেননা দরাদরি করার ইচ্ছে তার মোটেই ছিল না। "অপূর্ব, সেরা জাতের রেশম,"

দোকানদার বলে চলল, "জিনিসের কোন তুলনা নেই, কেবল আমার দোকানেই এরকম মাল পাবেন।"

শেষ পর্যন্ত লোকটার পরম পুলক যখন সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়ে গেল তখন গ্রে তার সঙ্গে কথা বলে মাল পোঁছে দেওয়ার ব্যাপারে বন্দোবস্ত করে নিল, খরচটা সে নিজেই দেবে বলল, তারপর বিল মিটিয়ে দিয়ে প্রস্থান করল। দোকানের মালিক তাকে যে রকম সম্মান দেখিয়ে দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিল তাতে মনে হল সে যেন চীন সম্রাট। এই সময়, যে-রাস্তার ওপর দোকানটা ছিল তার ওপারে কোন এক ভবঘুরে বাদ্যকর ভিয়োলিনচেল্লোর তারে সুরে বেঁধে মৃদু ছড়ের টান দিয়ে একটা করুণ অথচ সুন্দর সুর বার করল; তার সঙ্গী, বাঁশি বাজিয়েটি তারের বাজনার ওপর বর্ষণ করে চলল আধ-আধ কণ্ঠের সবেগে নির্গত শিসধ্বনি। যে সাদাসিধে গানের সুরে তারা গরমে ঝিমন্ত প্রাঙ্গণ মুখরিত তুলছিল তা গ্রের কানে যেতেই সে বুঝতে পারল অতঃপর তার কী করা উচিত। মোটের ওপর এই কয়দিন সে অধ্যাত্ম দৃষ্টির এমন এক সুখকর উচ্চমার্গে ছিল যেখান থেকে বাস্তবের সমস্ত ইঙ্গিত ও আভাস তার পক্ষে স্পষ্ট লক্ষ করা সম্ভব হয়। গাড়িঘোড়া যাতায়াতের আওয়াজে চাপা-পড়া সুর শুনতে শুনতে, এই সঙ্গীত তারই নিজের চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অতি গুরুত্বপূর্ণ যে-সমস্ত বোধ ও চিন্তাভাবনা জাগ্রত করে তোলে, গ্রে সেগুলির মর্মস্থলে প্রবেশ করল আর তখনই অনুভব করল, সে যা মনে মনে ভেবে রেখেছে তা কী কারণে এবং কী ভাবে ভালোয় ভালোয় সম্পন্ন হবে। গলি পেরিয়ে গ্রে ঢুকল একটা বাড়ির ফটকে, যেখানে চলছিল বাজনার আসর। ইতিমধ্যে বাজনাদাররা স্থান ত্যাগের উদ্যোগ করছে; ঢ্যাঙা বাঁশিওয়ালাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে আত্মসম্মানে জলাঞ্জলি দিয়েছে,—যে জানলাগুলি থেকে পয়সা এসে পড়ছিল সেই দিকে সে টুপি নাড়াচ্ছিল। ভায়োলিনচেল্লো ইতিমধ্যে তার মালিকের বগলের তলায় ফিরে গেছে; লোকটা কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বাঁশিওয়ালার জন্য অপেক্ষা করছিল।

"আরে তুমি নাকি ৎসিমার!" চেল্লোবাদককে চিনতে পেরে গ্রে বলল। লোকটা সন্ধ্যাবেলায় অপূর্ব বাজনা বাজিয়ে 'নগদ টাকা' সরাইখানার অতিথি নাবিকদের আনন্দ দিত। "বেহালা ছেড়ে তুমি কিনা ভায়োলিনচেল্লো ধরেছ?"

"মাননীয় ক্যাপ্টেন মশাই," আত্মতৃপ্তির ভাব নিয়ে আপত্তি তুলে বলল ৎসিমার, "যাতে আওয়াজ হয়, যা ক্যাঁ-কোঁ করে সে সমস্তই আমি বাজাই। অল্প বয়সে আমি ছিলাম বাজনাদার ক্লাউন। এখন শিল্পের দিকে আমি একটা টান অনুভব করি আর দুঃখের সঙ্গে দেখতে পাই যে আমার অসাধারণ প্রতিভাকে আমি নষ্ট করেছি। তাই দেরিতে লোভের বশে পড়ে আমি ভালোবেসে ফেলেছি একই সঙ্গে দুটিকে: চেল্লো আর বেহালা। ভায়োলিনচেল্লো বাজাই দিনের বেলায়, বেহালা বাজাই সন্ধ্যায়। মানে বলা যেতে পারে হারানো প্রতিভার জন্য কাঁদি, শোক করি। একটু মদ হবে কি, অ্যাঁ? ভায়োলিনচেল্লো হল আমার কারমেন, কিন্তু বেহালা..."

"আসল," গ্রে বলল।

ৎসিমার ঠিক মতো শুনতে পেল না।

"হ্যাঁ," মাথা নাড়িয়ে সায় দিয়ে বলল সে, "হ্যাঁ, ঝাঁঝ করতালে আর ব্রাস পাইপে

 সোলো হল আলাদা ব্যাপার। যাই হোক না কেন, আমার তাতে কী আসে যায়? শিল্পকলার ভাঁড়েরা ঢঙ্ করুক না — আমি জানি যে বেহালায় আর ভায়োলিনচেল্লোতে চিরকালই পরীদের অধিষ্ঠান।"

"আর আমার প্যাঁ-পোঁর ভেতরে কী আছে?" কাছে এগিয়ে আসতে আসতে জিজ্ঞেস করল বাঁশিওয়ালা। ছোকরা ঢ্যাঙা, তার নীল চোখজোড়ায় কেমন যেন ভেড়া-ভেড়া ভাব, আর দাড়ির রঙ্ ফেকাসে। "কী আছে, বল না?"

"নির্ভর করছে সকাল থেকে কতটা মদ পেটে পড়েছে তার ওপর। কখনও — পাখি, কখনও — মদের বাষ্প। ক্যাপ্টেন, এ হল আমার পার্টনার ডুস্। ওকে আমি বলেছি মদ খেলে আপনি কেমন মোহর ছড়ান, আর ও আপনাকে না দেখেই আপনার প্রেমে পড়ে গেছে।"

"হ্যাঁ, আমি ভালো ব্যবহার আর উদারতা পছন্দ করি," ডুস্ বলল। "তবে আমি লোকটা ধূর্ত, তাই আমার নীচ খোশামুদিতে বিশ্বাস করবেন না।"

গ্রে হাসতে হাসতে বলল, "এবারে যা বলি শোন। আমার সময় কম, অথচ কাজ ফেলে রাখার উপায় নেই। আমি তোমাদের একটা ভালো রোজগারের সুযোগ দিচ্ছি। একটা অর্কেস্ট্রার দল জড় কর, তবে যারা শবযাত্রায় বাজায় সে রকম সাজগোজ করা লোকদের নিয়ে নয় — ওরা গানবাজনায় নিজেদের কালোয়াতি দেখাতে ব্যস্ত, কিংবা ধর, তার চেয়েও বাজে — শব্দের দিকে ভোজনবিলাসীর মনোভাব থাকার ফলে যারা সুরের মর্ম ভুলে গিয়ে তাদের জটিল জগঝম্প দিয়ে ধীরে ধীরে মঞ্চের ওপর নিষ্প্রাণ অবস্থা সৃষ্টি করে — তাদের নিয়েও নয়। জুটিয়ে নিয়ে এসো তোমার নিজের লোকজনদের, যারা কাঁদাতে পারে সরল মনকে, রাঁধুনীদের আর চাকর-বাকরদের; জুটিয়ে নিয়ে এসো তোমার ভবঘুরেদের। সমুদ্র আর ভালোবাসার কাছে পণ্ডিতদের কোন ঠাঁই নেই। আমি তোমাদের সঙ্গে একটু বসতে পারলে খুশিই হতাম — এক বোতল কেন, তার বেশিই খাওয়া যেত, কিন্তু আমাকে যেতে হবে। আমার বহু কাজ। এটা নাও, 'আ' অক্ষরের জন্যে পান কোরো। আর আমি যা বললাম তা যদি তোমাদের মনে ধরে তা হলে আজ সন্ধ্যায় 'সিক্রেট' জাহাজে এসো; জাহাজটা প্রথম বাঁধের কাছেই ভিড়ানো আছে।"

"রাজী!" ৎসিমার চেঁচিয়ে বলল, কেননা তার জানা ছিল যে গ্রে রাজার মতো খরচ করে। "ওরে ডুস্, মাথা নুইয়ে নমস্কার জানা, বল, "হ্যাঁ", আর আনন্দে টুপি ওড়া! ক্যাপ্টেন গ্রে বিয়ে করতে চান!"

"হ্যাঁ," গ্রে শুধু এই কথাটি বলল। "বিশদ আমি তোমাদের জানাব 'সিক্রেটে'। তোমরা কিন্তু..."

"'আ' অক্ষরের জন্যে!" কনুই দিয়ে ৎসিমারকে ঠেলা দিয়ে গ্রের দিকে চোখ টিপল ডুস্। "কিন্তু... বর্ণমালায় কত অক্ষরই না আছে! খণ্ড-ত অক্ষরটার জন্যেও কিছু দিন না..."

গ্রে আরও টাকা দিল। বাজিয়েরা চলে গেল। গ্রে তখন এক কমিশন এজেন্টের অফিসে গিয়ে মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে এজেন্টকে একটা গোপন কাজের ভার দিল — কাজটা শেষ করতে হবে তাড়াতাড়ি, ছয় দিনের মধ্যে। গ্রে যখন নিজের জাহাজে ফিরল ততক্ষণে এজেন্টটিও একটি স্টীমারে চাপছিল। সন্ধ্যা নাগাদ রেশমী কাপড় এলো। নাবিকদের সঙ্গে গ্রের ভাড়া করা পাঁচজন পাল খাটানোর কারিগর এসে জুটল। লেতিকা তখনও ফেরে

নি, বাজিয়েরাও হাজির হয় নি। গ্রে এই অবসরে প্যাপ্টেনের সঙ্গে একটু কথাবার্তা সেরে
নিতে চলল।

লক্ষণীয় এই যে বেশ কয়েক বছর ধরে গ্রে একই নাবিকের দল নিয়ে সমুদ্রযাত্রা করছে। প্রথম প্রথম নাবিকদের অবাক করে দিত ক্যাপ্টেনের খামখেয়ালিতে হঠাৎ হঠাৎ থেমে যাওয়া — কখনও কখনও মাসের পর মাস, ব্যবসা-বাণিজ্যের একেবারেই অনুপযুক্ত জনমানবশূন্য জায়গায়; কিন্তু ধীরে ধীরে গ্রের 'গ্রে-তন্ত্রে' তারা অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে। সমুদ্র যাত্রার সময় প্রায়ই তার জাহাজে মাল বলতে থাকত শুধু জাহাজ স্থির রাখার জন্য তলদেশে স্থাপিত প্রয়োজনীয় পরিমাণ ভার। লাভজনক শর্তে মাল বহন করতে সে রাজী হত না একমাত্র এই কারণে যে প্রস্তাবিত মাল তার পছন্দসই নয়। সাবান, পেরেক, যন্ত্রপাতির অংশ কিংবা এমন আরও সমস্ত জিনিস যা নিঃশব্দে, অন্ধকার খোলের মধ্যে পড়ে থেকে একঘেয়ে প্রয়োজনীয়তার নিষ্প্রাণ ধারণার উদ্রেক করে, সেগুলি চালানের জন্য কেউই তাকে বলে-কয়ে রাজী করাতে পারত না। কিন্তু ফল, চীনেমাটির জিনিসপত্র, জীবজন্তু, মশলাপাতি, চা, তামাক, কফি, রেশমী কাপড়, মূল্যবান জাতের কাঠ — আবলুস, চন্দন আর সেগুন কাঠ সে সাগ্রহে জাহাজে তুলত। তার কল্পনার মধ্যে যে অভিজাততন্ত্র ছিল এসব তারই উপযোগী এবং সেই সঙ্গে তা একটা বর্ণাঢ্য পরিবেশও গড়ে তোলে; তাই 'সিক্রেটের' জাহাজীরা এই ভাবে মৌলিক বৈশিষ্ট্যের মনোভাবে দীক্ষিত হওয়ার ফলে তুচ্ছ মুনাফার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন আর সব জাহাজকে যে খানিকটা অবজ্ঞার চোখে দেখবে এতে আর আশ্চর্যের কী আছে? তা সত্ত্বেও গ্রে এবারে তাদের চেহারায় প্রশ্নের ভাব লক্ষ করল। একেবারে গবেট নাবিকও পরিষ্কার জানত যে বনের ভেতরে নদীখাতে মেরামতের জন্য জাহাজ ভিড়ানোর কোন দরকার ছিল না।

প্যাপ্টেন অবশ্য গ্রের নির্দেশ তাদের জানিয়ে দিয়েছে। গ্রে যখন তার মেটের কেবিনে প্রবেশ করল তখন সে কেবিনের ভেতরে পায়চারি করতে করতে ষষ্ঠ সিগারটি শেষ করতে চলেছে; ধোঁয়ায় তার মাথা এমন ঝিমঝিম করছিল যে সে চেয়ারের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছিল। সন্ধ্যা নেমে আসছিল; খোলা ঘুলঘুলি ভেদ করে ভেতরে ঢুকছিল সোনালি আলোর রশ্মি আর তাতে জ্বলজ্বল করছিল ক্যাপ্টেনের টুপির পালিশ-করা কানা।

"সব কিছু তৈরি," প্যাপ্টেন গোমড়া মুখে বলল। "যদি চান ত নোঙ্গর তোলা যেতে পারে।"

"প্যাপ্টেন, আপনি নিশ্চয়ই আমাকে কিছুটা ভালো জানেন," গ্রে নরম সুরে বলল। "আমি যা করছি তার মধ্যে গোপন কিছু নেই। লিলিয়ানায় নোঙ্গর ফেলামাত্র আমি সব বলব, তখন আর খারাপ সিগারের পেছনে এতগুলো দেশলাইয়ের কাঠি আপনাকে খরচ করতে হবে না। যান, নোঙ্গর তুলুন।"

প্যাপ্টেন অপ্রতিভ হয়ে মৃদু হেসে ভুরু চুলকাল।

"হ্যাঁ, তা ঠিকই," সে বলল, "অবশ্য আমি — না, না, আমার কিছু হয় নি।"

সে বেরিয়ে যাবার পর গ্রে খানিকক্ষণ স্থির হয়ে বসে বসে আধ-খোলা দরজা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর উঠে নিজের কেবিনে চলে গেল। সেখানে সে একটু বসে, তারপর শুয়ে পড়ল, আবার উইণ্ডল্যাস যখন সরব শিকলটাকে কটকট শব্দে

 ওপরে টেনে তুলল তখন উৎকর্ণ হয়ে সেই আওয়াজ শুনল। সে একবার সামনের ডেকে উঠে আসার জন্য পা বাড়াল, কিন্তু আবার কী যেন ভেবে টেবিলের দিকে ফিরে গিয়ে আঙ্গুল দিয়ে এক টানে অয়েল ক্লথের ওপর একটা সরল রেখা আঁকল। দরজার ওপর ঘুষির আওয়াজ হতে মানসিক বিকারগ্রস্ত অবস্থা থেকে সে নিস্কৃতি পেল; চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে লেতিকাকে ভেতরে আসতে দিল। নাবিক দাঁড়িয়ে পড়ে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে লাগল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোন ভগ্নদূত, সময়মতো ফাঁড়া কাটিয়ে এসেছে।

সে হড়বড় করে বলতে লাগল ,"আমি যখন জেটি থেকে দেখতে পেলাম আমাদের ছেলেরা হাতের তালুতে থুতু ছিটিয়ে তালি বাজাতে বাজাতে উইন্ডল্যাসের চার ধারে বেদম নাচ নাচছে, তখন মনে মনে বললাম, 'শিগগির যাও লেতিকা।' আমার চোখ হল গিয়ে বাজপাখির চোখ। তাই ছুটে এলাম। বোটম্যানের গায়ে আমি এমন নিশ্বাস ছাড়লাম যে সে নার্ভাস হয়ে ঘেমে উঠল। ক্যাপ্টেন, আপনি কি আমাকে পাড়ে ছেড়ে চলে যাবার মতলবে ছিলেন?"

লেতিকার লাল টকটকে চোখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে গ্রে বলল, "লেতিকা, আমি কিন্তু আশা করি নি যে তুমি সকাল গড়িয়ে এসে হাজির হবে। মাথায় ঠান্ডা জল ঢেলেছ কি?"

"ঢেলেছি। যতটা ভেতরে পুরেছি, ততটা অবশ্য নয়, তবে ঢেলেছি। সব কাজ করেছি।"

"বল।"

"বলে লাভ নেই, ক্যাপ্টেন। এই যে এখানে সব লেখা আছে। ধরুন, পড়ুন। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। আমি চললাম।"

"কোথায়?"

"আপনি যে রকম কটমট করে আমার দিকে তাকাচ্ছেন তাতে মনে হচ্ছে যে আমার মাথায় এখনও যথেষ্ট ঠান্ডা জল ঢালা হয় নি।"

সে উলটো দিকে ফিরে অন্ধের মতো অদ্ভুত ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেল। গ্রে কাগজের ভাঁজ খুলল; কাগজের ওপর দিয়ে যখন বাঁকাচোরা বেড়ার মতো রেখাগুলি আঁকা হয় তখন পেন্সিল সম্ভবত অবাক হয়ে গিয়েছিল। লেতিকা যা লিখেছিল তা এই রকম:

"নির্দেশ অনুযায়ী। পাঁচটার পর রাস্তা ধরে হাঁটলাম। একটা বাড়ি। তার ছাইরঙা ছাদ, দুপাশে দুটো জানলা। বাড়ির লাগোয়া একটা সবজী বাগান আছে। যার খোঁজ করতে বলা হয়েছিল সে দুবার বাইরে আসে: একবার জল নিতে আরেক বার আগুন জ্বালানোর কাঠকুটোর জন্য। অন্ধকার হয়ে আসতে জানলা দিয়ে ভেতরে উঁকি মারলাম, কিন্তু পর্দার জন্য কিছুই দেখতে পেলাম না।"

অতঃপর পারিবারিক প্রকৃতির কয়েকটি মন্তব্য ছিল। সেগুলি লেতিকা জুটিয়েছে সম্ভবত বোতল নিয়ে কথাবার্তা বলতে গিয়ে, কেন না স্মারকলিপিটি আকস্মিক ভাবে এসে শেষ হয়েছে এই কথাগুলি দিয়ে: "খরচ মেটানোর জন্য নিজের গাঁট থেকে সামান্য যোগ করতে হল।"

কিন্তু এই বিবরণীর সারকথা কেবল ততটুকুই জানাল, যা আমরা প্রথম পরিচ্ছেদ

থেকেই জেনেছি। গ্রে কাগজটা টেবিলের ওপর রেখে দিল, পাহারার লোকটিকে শিস
দিয়ে ডাকল, প্যাণ্টেনকে ডেকে আনতে পাঠাল। কিন্তু মেটের বদলে জামার গোটানো আস্তিন টেনে লাফাতে লাফাতে ব্যস্তসমস্ত হয়ে এসে হাজির হল সারেঙ্গ অ্যাটউড্।

"আমরা বাঁধের কাছে ভিড়িয়েছি," সে বলল, "প্যাণ্টেন জানতে পাঠাল আপনি কী বলেন। প্যাণ্টেন ব্যস্ত আছে, ওখানে তুরী-ভেরী, ঢাকঢোল আর বেহালাটেহালা নিয়ে কারা যেন ওর ওপর হামলা শুরু করে দিয়েছে। আপনি কি ওদের 'সিক্রেটে' ডেকেছেন? প্যাণ্টেন আপনাকে একবার আসতে বলছে। সে বলছে তার মাথা গুলিয়ে গেছে।"

"হ্যাঁ অ্যাটউড্," গ্রে বলল, "ঠিকই, আমি বাজিয়েদের ডেকেছি। ওদের গিয়ে বলুন, ওরা আপাতত যেন খালাসীদের কোয়ার্টারে যায়। পরে দেখা যাবে ওদের নিয়ে কী করা যায়। অ্যাটউড্, ওদের আর জাহাজের মাল্লাদের বলুন যে আমি পনেরো মিনিট বাদে ডেক্-এ উঠে আসছি। সকলে যেন তৈরি হয়ে থাকে। আপনি এবং প্যাণ্টেনও আশা করি আমার কথা শুনবেন।"

অ্যাটউড্ বন্দুক খাড়া করার ভঙ্গিতে তার বাঁ ভুরুটা তুলল, দরজার একপাশে একটুখানি দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে গেল। এই দশ মিনিট গ্রে কাটাল করতলে মুখ ঢেকে; সে কোন কিছুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল না, কোন রকম হিসাবও করছিল না, কিন্তু তার মনে মনে ইচ্ছে হচ্ছিল খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকে। ইতিমধ্যে সকলে অধীর আগ্রহে, নানা রকম অনুমান করতে করতে কৌতূহলের সঙ্গে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। গ্রে বেরিয়ে এসে তাদের চোখমুখে অভাবনীয় বস্তুর প্রত্যাশা দেখতে পেল, কিন্তু যা ঘটতে চলেছে গ্রে নিজে তাকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মনে করায় অন্য সকলের মনের এই উদ্বেগ তার ওপর মৃদু বিরক্তির ছাপ ফেলল।

"বিশেষ কিছুই নয়," ব্রিজ ল্যাডারের ওপর বসতে বসতে গ্রে বলল। "আমরা যতক্ষণ না জাহাজের গোটা পাল পালটাচ্ছি ততক্ষণ নদীর মোহানায় দাঁড়িয়ে থাকব। তোমরা দেখেছ ত লাল রেশমী কাপড় আনা হয়েছে; ঐ কাপড় থেকে পাল তৈরির কারিগর ব্লেণ্টের কর্তৃত্বে 'সিক্রেটের' জন্য নতুন পাল বানানো হবে। তারপর আমরা যাত্রা করব, তবে কোথায়—বলব না। যাই হোক না কেন এখান থেকে দূরে নয়। আমি যাচ্ছি স্ত্রীর কাছে। সে অবশ্য এখনও আমার স্ত্রী নয়, তবে হবে। আমার দরকার হবে রাঙা পাল, যাতে তার সঙ্গে আমার যা শর্ত হয়েছিল সেই অনুযায়ী দূর থেকেই সে আমাদের লক্ষ করতে পারে। এই হল কথা। সুতরাং দেখতে পাচ্ছেন ত এখানে রহস্যের কিছুই নেই। এ সম্পর্কে আর কোন কথা নয়।"

"আচ্ছা," অ্যাটউড্ বলল, যখন সে নাবিকদের হাসিমুখ দেখে বুঝতে পারল যে তারা হতবুদ্ধি হলেও আনন্দিত, কিন্তু কেউই কথা বলতে ভরসা পাচ্ছে না। "তা হলে এই হল ব্যাপার, ক্যাপ্টেন। এই নিয়ে বিচার করা আমাদের অবশ্যই সাজে না। আপনি যেমন ইচ্ছে করেন তা-ই হবে। আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

"ধন্যবাদ!"

গ্রে শক্ত করে সারেঙ্গের হাত চেপে ধরল। কিন্তু সারেঙ্গ অবিশ্বাস্য রকমের শক্তি প্রয়োগ করে এমন করমর্দনে তার প্রত্যুত্তর দিল যে ক্যাপ্টেনকে হার মানতে হল। এর পর একের

 পর এক সকলে সলজ্জ আন্তরিক দৃষ্টিতে এগিয়ে এসে বিড়বিড় করে অভিনন্দন জানাল। কেউ চেঁচাল না, কেউ হৈচৈ করল না — কেননা ক্যাপ্টেনের কাটা কাটা কথাগুলির মধ্যে নাবিকেরা এমন একটা কিছু উপলব্ধি করেছে যা মোটেই সাধারণ নয়। ক্যাপ্টেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল, উল্লসিত হয়ে উঠল — তার বুকের ভার নেমে গেছে। একমাত্র জাহাজের ছুতোরকে কেন যেন অসন্তুষ্ট দেখা গেল; অবসন্ন ভাবে গ্রের হাত ধরে বিরস কণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করল:

"এটা কী করে আপনার মাথায় খেলল, ক্যাপ্টেন?"

"তোমার কুড়ুলের কোপের মতো," গ্রে বলল। "ৎসিমার! তোমার ছেলেদের কেরামতি দেখা যাক।"

বেহালাবাদক বাজনাদারদের পিঠে চাপ মারল, ভিড়ের ভেতর থেকে ঠেলতে ঠেলতে বার করে আনল নেহাৎই নোংরা বেশবাস পরনে সাতটি লোককে।

"এই যে," ৎসিমার বলল, "এ হল ট্রম্‌বোন; বাজনা ত নয় যেন কামানের গোলাবর্ষণ। গোঁফছাড়া এই দুই ছোকরা হল ট্রামপেট বাজিয়ে। ওদের বাজনা শুনলেই মনে হয় যুদ্ধ করতে নেমে পড়ি। এরপর ক্ল্যারিনেট, কর্ণেট-আ-পিস্টন, আর সঙ্গতের বেহালা। এরা সকলে — বড় বড় ওস্তাদরা মিলে সঙ্গত করছে এক আমুদে মুলে বাজিয়ের সঙ্গে, অর্থাৎ আমার সঙ্গে। আর এই হল আমাদের আমুদে দলের বড় কর্তা — ফ্রিৎস, ঢাকী। ঢাকীদের, বুঝলেন কিনা, সচরাচর দেখতে হয় হোপলেস, কিন্তু এই ঢাকীটি বাজায় দারুণ উৎসাহ নিয়ে, দাপটের সঙ্গে। ওর বাজনার মধ্যে ওর ঢাকের কাঠির মতোই খোলাখুলি আর সোজাসুজি কিছু একটা আছে। ঠিক যেমন যেমন বলেছিলেন করেছি ত ক্যাপ্টেন গ্রে?"

"চমৎকার!" গ্রে বলল। "তোমাদের সকলের জন্য জাহাজের খোলের মধ্যে আলাদা জায়গা করে দেওয়া হয়েছে, তার মানে ঐ জায়গা এবারে ভরাট হবে নানা রকমের হালকা চটুল সুর, ঢিমে তাল আর চড়া পর্দার সুরে। যে যার জায়গায় যাও। ক্যাপ্টেন, নোঙ্গর উঠিয়ে যাত্রা শুরু করুন। দু ঘণ্টা বাদে আমি আপনার জায়গায় যাচ্ছি।"

এই দু-ঘণ্টা যে কী করে কেটে গেল তা সে লক্ষই করল না, কেননা সময়টা কাটল সেই একই অন্তঃসলিলা গুঞ্জনের তালে তালে যা তার চেতনাকে কখনও ছেড়ে যায় নি, যেমন নাড়ীর স্পন্দন ছেড়ে যায় না ধমনীকে। তার ছিল এক চিন্তা, এক ইচ্ছা, এক লক্ষ্য। কাজের মানুষ সে, আগে থেকে মনে মনে ভেবে রাখল ঘটনার গতিপ্রকৃতি, তার একমাত্র আক্ষেপ হল এই যে ড্রট খেলার ঘুঁটি চালানের মতো অত সহজে, অত চটপট ঐ সব ঘটনাকে চালানো যাবে না। মাথার ওপর একটা বিরাট ঘণ্টা বাজার গম্‌গম আওয়াজের মতো উত্তেজনাকর যে অনুভূতি তার সর্বাঙ্গে কান-ফাটানো স্নায়বিক আর্তনাদের মতো দুলে দুলে অনুরণন তুলছিল, গ্রের বাইরের প্রশান্ত ভাবের মধ্যে সে সবের কোন চিহ্নই ছিল না। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত এত দূর গড়াল যে সে মনে মনে গুনতে শুরু করল: 'এক... দুই... তিরিশ...' ইত্যাদি, যতক্ষণ না উচ্চারণ করল 'এক হাজার'। এ রকম মানসিক অনুশীলনে কাজ হল; শেষ পর্যন্ত সে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে গোটা উদ্যোগটাকে দেখতে সক্ষম হল। এখানে সে খানিকটা আশ্চর্য হল এই ভেবে যে আসল যে ভেতরে ভেতরে কেমন তা তার পক্ষে ধারণা করা সম্ভব হচ্ছে না, যেহেতু আসলের সঙ্গে তার কোন

বাক্যালাপ পর্যন্ত হয় নি। গ্রে কোথায় যেন পড়েছিল যে কেউ যদি কোন লোকের জায়গায় নিজেকে কল্পনা করে নিয়ে তার মুখের ভঙ্গি নকল করে তা হলে অস্পষ্ট ভাবে হলেও সেই লোককে বোঝা যেতে পারে। গ্রের চোখে ইতিমধ্যেই তার স্বভাববহির্ভূত অদ্ভুত অভিব্যক্তি ফুটে উঠতে লাগল, আর গোঁফের নীচে ঠোঁটজোড়ায় ধরতে শুরু করল মৃদু, বিনম্র হাসি, এমন সময় হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেয়ে সে হো হো করে হেসে উঠল, কেবিন থেকে বেরিয়ে পড়ল প্যান্টেনকে অবসর দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

অন্ধকার হয়ে এসেছে। প্যান্টেন তার জ্যাকেটের কলার তুলে কম্পাসের সামনে পায়চারি করতে করতে কাণ্ডারীর উদ্দেশে বলে চলছিল: "পোর্ট, কোয়ার্টার পয়েণ্ট, পোর্ট। স্টপ্। আরও কোয়ার্টার পয়েণ্ট।" 'সিক্রেট' অর্ধেক পালে অনুকূল হাওয়ায় ছুটে চলেছে।

"জানেন," প্যান্টেন গ্রেকে বলল, "আমি খুশি।"

"কিসে?"

"যেই কারণে আপনি, আমিও সেই কারণে। আমি সব বুঝতে পেরেছি। এই যে এখানে এই ব্রিজটার ওপর..." বলে সে ধূর্তের ভঙ্গিতে চোখ টিপল, পাইপের আগুনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার হাসি।

"শুনি, শুনি," ব্যাপারটা কী, হঠাৎ আঁচ করতে পেরে গ্রে বলল, "ওখানে আপনি কী বুঝলেন?"

"চোরাকারবার চালানোর সেরা উপায়," প্যান্টেন ফিসফিস করে বলল। "যে কেউ যেমন খুশি তেমন পাল খাটাতে পারে। আপনার দারুণ মাথা, গ্রে!"

"বেচারি প্যান্টেন!" ক্যাপ্টেন রাগবেন না হাসবেন বুঝতে না পেরে বললেন। "আপনার অনুমানের মধ্যে রসবোধ আছে বটে, কিন্তু কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। ঘুমোতে যান। আপনাকে যা বলার বলেছি -- আপনি ভুল করছেন। আমি যা বলেছি তা-ই করছি।"

গ্রে তাকে ঘুমোতে পাঠিয়ে দিল, গতিপথ ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করে নিয়ে বসে পড়ল। এবারে আমরা তাকে ছেড়ে দেব, কেননা তার একা থাকা দরকার।

৬

আসল রইল একা

লংগ্রেন সমুদ্রে রাত কাটাল। সে ঘুমোয় নি, মাছও ধরে নি, জলের ছলাত্ ছলাত্ আওয়াজ শুনতে শুনতে, অন্ধকারে দৃষ্টি মেলে, বাতাসের ঝাপটা খেতে খেতে আর ভাবতে ভাবতে পাল তুলে দিয়ে সে চলেছে নিরুদ্দেশ যাত্রায়। জীবনের কঠিন মুহূর্তে এই নিঃসঙ্গ ভ্রমণের মতো আর কোন কিছুই তার মনোবল এতটা উদ্ধার করতে পারত না। নিস্তব্ধতা, কেবল নিস্তব্ধতা ও নির্জনতা — অন্তর্জগতের ক্ষীণতম ও অতি দুর্বোধ্য কণ্ঠস্বর যাতে বোধগম্য হয়ে বেজে ওঠে তার জন্য এটাই সে চাইছিল। এই রাতে সে ভাবছিল ভবিষ্যতের কথা, দারিদ্র্যের কথা, আসলের কথা। তার পক্ষে স্বল্প সময়ের

 জন্যও আসলকে ত্যাগ করা বড় কঠিন ছিল। তাছাড়া তার ভয় ছিল প্রশমিত বেদনা আবার জেগে না ওঠে। সম্ভবত জাহাজে চাকরী নেওয়ার পর সে আবার মনে মনে কল্পনা করবে যে ওখানে, কাপের্ণায় তার জন্য অপেক্ষা করছে তার প্রিয়তমা, যার কখনই মৃত্যু হয় নি; এবং ফিরে এসে সে বাড়ির দিকে পা বাড়াবে নিষ্প্রাণ প্রতীক্ষার বেদনা বুকে নিয়ে। মেরী আর কখনও বাড়ির দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসবে না। কিন্তু তার বাসনা ছিল আসলের অন্নের যেন অভাব না হয়, তাই সে ঠিক করল আসলের যত্নের জন্য যা যা দরকার সে করবে।

লংগ্রেন যখন ফিরল মেয়ে তখনও বাড়ি ফেরে নি। মেয়ের প্রাতঃকালীন ভ্রমণে বাপ বিভ্রান্ত হত না; কিন্তু এবারে তার প্রতীক্ষায় লংগ্রেন খানিকটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। এক কোনা থেকে আরেক কোনায় পায়চারি করতে করতে মুখ ফেরাতে হঠাৎ সে দেখতে পেল আসলকে। আসল দ্রুত অথচ নিঃশব্দে প্রবেশ করে কোন কথা না বলে তার সামনে এসে দাঁড়াল। তার চোখের আলোতে ফুটে উঠেছিল উত্তেজনা। লংগ্রেন তা দেখে প্রায় ভয় পেয়ে গেল। মনে হচ্ছিল যেন উদ্‌ঘাটিত হয়েছে আসলের দ্বিতীয় সত্তা — মানুষের সেই প্রকৃত সত্তা যার কথা সচরাচর বলে থাকে চোখ। লংগ্রেনের মুখের দিকে চেয়ে সে এমন দুর্বোধ্য ভঙ্গিতে চুপ করে রইল যে লংগ্রেন তাড়াতাড়ি তাকে জিজ্ঞেস করল:

"তোর কি অসুখ করেছে?"

সে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না। প্রশ্নের অর্থটি শেষ পর্যন্ত যখন আসলের মর্মে গিয়ে প্রবেশ করল তখন সে হাতের স্পর্শ লাগা পল্লবের মতো শিহরিত হয়ে উঠল, দীর্ঘ, সুরেলা হাসি হাসল। সে হাসিতে ছিল প্রশান্ত বিজয়ের দীপ্তি। তার কোন একটা কথা বলার দরকার ছিল, কিন্তু বরাবর যেমন হয়ে থাকে, কথাটা যে ঠিক কী তা ভেবে দেখার প্রয়োজনই সে বোধ করল না। সে বলল:

"না, আমি সুস্থ।... তুমি অমন করে তাকাচ্ছ কেন? আমার আনন্দ হচ্ছে। সত্যিই আমার আনন্দ হচ্ছে, কেননা দিনটা বড় সুন্দর। আর তুমি মনে মনে কী ঠিক করলে? তেমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি কিছু একটা ঠিক করেছ।"

মেয়েকে কোলের ওপর বসাতে বসাতে লংগ্রেন বলল, "আমি মনে মনে যা-ই ঠিক করি না কেন, জানি যে ব্যাপারটা কী, তুই বুঝতে পারবি। আমাদের বাঁচার মতো কোন অবলম্বন নেই। আমি আবার সেই দূরের সমুদ্রপথে পাড়ি দেব না, আমি কাজ নেব ডাকের স্টীমারে — কাসেত আর লিসের মধ্যে যে ডাক-স্টীমার যাতায়াত করে, তাতে।"

"হ্যাঁ," লংগ্রেনের উদ্বেগ ও কাজের মর্ম উদ্ধারের চেষ্টা করতে গিয়ে সে আচ্ছন্নের মতো বলল, কিন্তু আতঙ্কিত হয়ে লক্ষ করল যে মনের আনন্দ আর কিছুতেই চেপে রাখতে পারছে না। "ব্যাপারটা বড় খারাপ। আমার মন খারাপ লাগবে। যত তাড়াতাড়ি পার ফিরে এসো।" এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে অদম্য হাসিতে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। "হ্যাঁ, বাবা, যত তাড়াতাড়ি পার। আমি তোমার পথ চেয়ে বসে থাকব।"

লংগ্রেন তার দু হাতের করতল দিয়ে মেয়ের মুখ ধরে নিজের দিকে ঘুরিয়ে বলল, "আসল! বল্ দেখি, কী হয়েছে?"

আসল অনুভব করল লংগ্রেনের উদ্বেগ দূর করা দরকার, তাই সে তার উল্লাস কাটিয়ে

উঠে গভীর মনোযোগী হয়ে পড়ল, কেবল তার দ্ চোখে প্রকাশ পেতে লাগল নবজীবনের দীপ্তি।

"তুমি অদ্ভুত," সে বলল। "কিছুই হয় নি। আমি বাদাম কুড়োচ্ছিলাম।"

লংগ্রেন একথা মোটেই বিশ্বাস করত না যদি সে নিজের চিন্তাভাবনা নিয়ে ব্যস্ত না থাকত। তাদের কথাবার্তা হল কাজের আর বিশদ। নাবিক তার মেয়েকে থলি গুছিয়ে দিতে বলল, যা যা জিনিস তার দরকার বলল, শেষে কয়েকটি পরামর্শ দিল:

"আমি দিন দশেক বাদে ফিরব। তুই আমার বন্দুকটা বন্ধক দিবি, বাড়িতে বসে থাকবি। কেউ যদি তোকে অপমান করার তালে থাকে তা হলে বলবি লংগ্রেন শিগগিরই ফিরে আসবে। আমার সম্পর্কে ভাবিস না, চিন্তা করিস না—খারাপ কিছুই ঘটবে না।"

এরপর লংগ্রেন খেয়ে নিল, মেয়েকে গভীর স্নেহভরে চুমু দিল, কাঁধের ওপর থলিটা ফেলে শহরের পথ ধরল। আসল দৃষ্টি দিয়ে তাকে অনুসরণ করল, যতক্ষণ না পথের বাঁকে সে আড়াল হয়ে গেল; তারপর আসল ঘরে ফিরল। তার সামনে ঘরের অনেক কাজ, কিন্তু কাজের কথা সে ভুলে গেল। সে চারদিকে দৃষ্টিপাত করল মৃদু বিস্ময়মিশ্রিত ঔৎসুক্য নিয়ে। এই যে বাড়িটা, যা ছেলেবেলা থেকে তার চেতনায় এমন ভাবে গেঁথে আছে, যার রূপ সে চিরকাল নিজের মনের ভেতরে বহন করে এসেছে বলে তার মনে হয়েছে, সেখানে যেন সে এখন আগন্তুক, সেটাকে দেখে এখন অন্য কোন জীবনের পরিধি থেকে বহু বছর বাদে ফিরে এসে জন্মস্থান দর্শনের মতো অনুভূতি জাগছে। কিন্তু তার মনে হল এই পর হয়ে যাওয়ার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা অসঙ্গত, বেমানান। লংগ্রেন যে টেবিলের ওপর খেলনা বানাত আসল তার ধারে গিয়ে বসল জাহাজের পেছন দিকে আঠা দিয়ে হাল লাগানোর চেষ্টা করল। এই জিনিসগুলির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তারা যেন ওর সামনে বড় আকারের, সত্যিকারের হয়ে দেখা দিল। সকালে যা যা ঘটেছিল তা আবার মনের ভেতরে জেগে উঠে উত্তেজনাকর শিহরন তুলল, আর সূর্যের মতো বিশাল আকারের এক সোনার আঙটি সমুদ্রের ওপর দিয়ে এসে তার পায়ের কাছে পড়ল।

ঘরে বসে না থেকে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে লিসের উদ্দেশে যাত্রা করল। সেখানে তার মোটেই কিছু করার ছিল না। কেন যাচ্ছে সে জানে না, কিন্তু না গিয়ে সে পারল না। রাস্তায় তার দেখা হল একজন পথচারীর সঙ্গে; লোকটা তার কাছ থেকে কোন এক জায়গার পথের সন্ধান চাইল। আসল তাকে প্রয়োজনীয় সন্ধান দিল, পরক্ষণেই ঘটনাটা ভুলে গেল।

দীর্ঘ পথের সমস্তটা সে কখন যে পেরিয়ে এলো তা খেয়ালই করতে পারে নি—মনে হচ্ছিল যেন সে সমস্ত দরদ ঢেলে দিয়ে একটা পাখিকে আদর করতে করতে বয়ে নিয়ে চলেছে। শহরের কাছাকাছি আসতে তার বিশাল পরিধি থেকে যে কোলাহল ভেসে আসে তাতে আসলের মনোযোগ খানিকটা বিক্ষিপ্ত হল। এই কোলাহল আগে তাকে ভীতসন্ত্রস্ত ও হতবিহ্বল করে দিত, তার মনের মধ্যে নির্বাক ভীরুতার সঞ্চার করত। কিন্তু এখন আর তা আসলের ওপর সে কর্তৃত্ব বিস্তার করতে পারল না। আসল সেই বাধা কাটিয়ে উঠল। গাছপালার নীল ছায়া পার হয়ে সমান তালে তালে পা ফেলে, পূর্ণ

 আস্থার সঙ্গে, সহজ সরল বিশ্বাস আর স্বচ্ছন্দ দৃষ্টিতে পথচারিদের দিকে তাকাতে তাকাতে সে ধীরে ধীরে চক্রাকার বুলভার অতিক্রম করে গেল। দিনের মধ্যে বেশ কয়েকবার তীক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন এক শ্রেণীর লোকের নজর গিয়ে পড়ল দেখতে অদ্ভুত প্রকৃতির, অজানা ওই মেয়েটির ওপর, যে বর্ণাঢ্য জনতার মাঝখান দিয়ে গভীর চিন্তায় ভাবিত হয়ে পথে চলছে। স্কোয়ারে এসে সে ফোয়ারার ধারার ওপর হাত রাখল, ছিটকে পড়া জলকণার মাঝখানে আঙুল নাড়াচাড়া করতে লাগল; তারপর একটু বসে বিশ্রাম করে নিয়ে বনের পথে ফিরল। ফিরতি পথ যখন সে ধরল তখন তার মন সতেজ। দিনের বিচিত্র বর্ণের দর্পণের বদলে সাঁঝের নদী শেষ পর্যন্ত ছায়ায় শান্ত উজ্জ্বল ধারণ করলে যেমন হয় সে-ও চলেছে ঐ রকম শান্ত ও স্বচ্ছ মেজাজে। পল্লীর কাছাকাছি আসতে তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল কয়লাওয়ালার, যে লোকটার একবার মনে হয়েছিল যে তার ঝুড়ি বুঝি পল্লবিত হয়ে উঠেছে। কয়লাওয়ালা দুই অচেনা গোমড়ামুখো লোকের সঙ্গে কয়লার গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। লোক দুটির সর্বাঙ্গে ঝুলকালি ও কাদা মাখা। আসল ওকে দেখে উল্লসিত হল।

"এই যে ফিলিপ, তুমি এখানে কী করছ?" আসল জিজ্ঞেস করল।

"কিছুই না গো। একটা চাকা আলগা হয়ে গিয়েছিল; ঠিক করে নিলাম, এখন একটু সিগারেট টানছি, সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে খানিকটা গল্পগুজব করছি। তুমি কোথা থেকে?"

আসল জবাব দিল না।

"জান ফিলিপ," আসল কথা বলল, "আমি তোমাকে বড় ভালোবাসি, তাই কেবল তোমাকেই বলছি। আমি শিগগিরই চলে যাচ্ছি। হয়ত চিরকালের মতো চলে যাব। তুমি যেন আবার কাউকে এ কথা বলো না।"

"তার মানে তুমি বলতে চাও, চলে যাচ্ছ? তা, কোথায় চললে জানতে পারি কি?" কয়লাওয়ালা অবাক হয়ে হাঁ করে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল, আর ফলে তার দাড়িটা দেখতে হল আরও লম্বাটে।

"জানি না," বনের ভেতরে যে ফাঁকা জায়গাটায় দেবদারু গাছের নীচে গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল, ধীরে ধীরে সে তাকাল সে দিকে, সন্ধ্যার গোলাপী আলোয় আলোকিত সবুজ ঘাসের দিকে, কালো চেহারার নির্বাক কয়লাওয়ালাদের দিকে, তারপর একটু ভেবে যোগ করল, "কিছুই আমার জানা নেই। আমি দিন জানি না, তারিখ জানি না, ঘণ্টা জানি না, এমনকি কোথায়, তাও জানি না। এর বেশি আমি কিছু বলব না। তাই, আগে থাকতেই বিদায় জানিয়ে রাখি। তুমি আমাকে প্রায়ই তোমার গাড়িতে চড়িয়েছ।"

আসল কয়লাওয়ালার বিশাল কালো হাতটা নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে সেটাকে কোন রকমে ঝাঁকুনি দিল। শ্রমিকের মুখে ফুটে উঠল একটা স্থির হাসির রেখা। আসল মাথা দুলিয়ে উলটো দিকে ফিরে ওখান থেকে সরে গেল। সে এত তাড়াতাড়ি অদৃশ্য হয়ে গেল যে ফিলিপ এবং তার বন্ধুরা মাথা ঘুরিয়ে দেখারও অবকাশ পেল না।

"আশ্চর্য!" কয়লাওয়ালা বলল। "বোঝ কাণ্ড, ওকে বোঝে সাধ্যি কার! ওর আজ যেন কী হয়েছে... কিছু একটা ব্যাপার আছে।"

"ঠিকই বলেছ," দ্বিতীয় জন তাকে সায় দিয়ে বলল, "কিন্তু ও যা বলল তা ঠিক

কিনা কে জানে, কিংবা নিছক আমাদের বিশ্বাস করানোর জন্য বলল — এমনও ত হতে পারে! মোটকথা, আমাদের ব্যাপার নয়।"

"হ্যাঁ, আমাদের ব্যাপার নয়," এই বলে তৃতীয় জন দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

এর পর ওরা তিন জনেই গাড়িতে চেপে বসল। পাথর বাঁধানো পথে চাকায় ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলতে তুলতে গাড়ি ধুলোর আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল।

৭

রাঙা 'সিক্রেট'

সাদা ফটফটে সকাল। অদ্ভুত ছায়া-ছায়া ভাবে পরিপূর্ণ কুয়াসার একটা সূক্ষ্ম আবরণ বনের ভেতরে জমে আছে। এক অজানা শিকারী সবে ক্যাম্পফায়ারের স্থান পরিত্যাগ করে নদী বরাবর পথ ধরেছে। গাছপালার ফাঁক দিয়ে নদীর বায়বীয় শূন্যতার আলো ঝলমল করছে, কিন্তু উদ্যোগী শিকারী সে দিকে না গিয়ে পাহাড়ের দিকে ভালুকের পায়ের সদ্য ছাপ চলে যেতে দেখে তা নিরীক্ষণ করতে লেগে গেল।

গাছপালার মাঝখান থেকে আশঙ্কাজনক পশ্চাদ্ধাবনের মতো অপ্রত্যাশিত ভাবে ভেসে এলো আচমকা আওয়াজ; এ হল ক্ল্যারিনেটের বাজনা। বাদক ডেকের ওপর উঠে এসে করুণ ও টানা টানা এক গানের সুর বারবার বাজিয়ে চলেছে। আওয়াজটা কাঁপছিল শোকাচ্ছন্ন কণ্ঠস্বরের মতো; দেখতে দেখতে তা বেড়ে উঠল, কাঁপা কাঁপা করুণ ধ্বনিপ্রবাহ তুলে হেসে উঠে হঠাৎই বন্ধ হয়ে গেল। দূরে প্রতিধ্বনি অস্পষ্ট গুঞ্জন তুলল সেই একই সুরের।

শিকারী একটা ভাঙা ডাল দিয়ে পায়ের ছাপ চিহ্নিত করে রেখে জলের দিকে চলল। কুয়াসা তখনও কাটে নি; তারই মাঝখানে দেখা যাচ্ছে একটা জাহাজের ঝাপসা দেহরেখা — জাহাজটা ধীরে ধীরে ঘুরে চলেছে নদীর মোহানার দিকে। তার গোটানো পালগুলি যেন প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠেছে — সেগুলি ফেস্টুনের আকারে ঝুলতে শুরু করেছে, তাদের ভাঁজ খুলে আসছে, বিশাল বিশাল পরতের দুর্বল ঢাল দিয়ে সেগুলি মাস্তুল ঢেকে দিচ্ছে। কণ্ঠস্বর আর পদশব্দ শোনা যাচ্ছিল। উপকূলবর্তী বায়ু হিল্লোল তোলার চেষ্টা করছিল, পালগুলিতে সৃষ্টি করছিল অলসভাবে কাঁপন; অবশেষে সূর্যের তাপে ঈপ্সিত ফল পাওয়া গেল; বায়ুর চাপ বৃদ্ধি পেল, কুয়াসা কেটে গেল এবং ইয়ার্ডের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে রাশি রাশি মৃদু লাল গোলাপের পরিপূর্ণ রূপ ধারণ করল। গোলাপী ছায়াগুলি সাদা ঝকঝকে মাস্তুল আর দড়িদড়ার ওপর দিয়ে পিছনে পড়ছিল। স্বচ্ছন্দে ফুলে ওঠা, ছড়ানো পাল ছাড়া, গভীর আনন্দের বর্ণসুষমা ছাড়া আর সবই ছিল সাদা।

শিকারী তীর থেকে দেখতে দেখতে অনেকক্ষণ চোখ রগড়ানোর পর শেষ পর্যন্ত নিশ্চিত হল যে সে ঠিক বৈ বেঠিক কিছু দেখছে না। জাহাজটা বাঁকে আড়াল হয়ে গেল কিন্তু

 শিকারী তখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল; তার পর চুপচাপ কাঁধ ঝাঁকিয়ে ভাল্লুকের উদ্দেশে যাত্রা করল।

'সিক্রেট' যতক্ষণ নদীখাত ধরে চলতে লাগল ততক্ষণ গ্রে হালের কাছে দাঁড়িয়ে রইল, কান্ডারীকে বিশ্বাস করে হাল ধরতে দিল না — অগভীর জলের জন্য তার ভয় ছিল। প্যাণ্টেন পাশে বসে ছিল। তার দাড়ি গোঁফ নিখুঁত কামানো, পরবে নতুন বনাতের স্যুট, মাথায় ঝকঝকে নতুন টুপি। তার অবস্থাটা হালছাড়া গোছের, মুখের ভাব থমথমে। আগের মতোই রাঙা সাজসজ্জা আর গ্রের সরল লক্ষ্যের মধ্যে কোন যোগসূত্র সে খুঁজে পাচ্ছে না।

গ্রে বলল, "এখন, আমার পালগুলো যখন ঝলমল করছে, বাতাস যখন চমৎকার, আর ছোট্ট বান্ রুটি দেখে হাতির যেমন আনন্দ হয়, আমার মনে আনন্দ যখন তার চেয়েও বেশি, তখন আমি লিসে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সেই অনুযায়ী আমার চিন্তাভাবনার সুরে আপনাকে বাঁধার চেষ্টা করব। মনে রাখবেন আমি আপনাকে মূর্খ কিংবা গোঁয়ার বলে ভাবি না। না, আপনি হলেন আদর্শ নাবিক, আর এর মূল্য অনেক। কিন্তু অধিকাংশ লোকের মতো আপনিও যাবতীয় সহজ সরল সত্যের কণ্ঠস্বর শুনে থাকেন জীবনের মোটা কাচের পর্দার ভেতর দিয়ে; ওরা চিৎকার করে, কিন্তু আপনারা শুনতে পান না। আমি যা করছি, সৌন্দর্য সম্পর্কে — অনধিগম্য সম্পর্কে পুরনো ধ্যানধারণা হয়ে তা আছে, অথচ আসলে তা শহরের বাইরে ছোটখাটো ভ্রমণ সারার মতোই অনায়াসসাধ্য ও সম্ভব। শিগগিরই আপনারা দেখতে পাবেন এক তরুণীকে — আমি আপনাদের চোখের সামনে যে প্রণালী হাজির করছি একমাত্র সেই প্রণালীতেই তার বিয়ে হতে পারে, আর কোন ভাবে নয়।"

আমরা যে কাহিনী ভালোভাবে জানি সেটিই সে সংক্ষেপে নাবিককে বলল এবং ব্যাখ্যানটা শেষ করল এই বলে:

"দেখতে পাচ্ছেন, এখানে ভাগ্য, মনের প্রবণতা আর চরিত্রপ্রকৃতির কেমন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। আমি চলেছি তার কাছে যে আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে এবং কেবল আমার জন্যই অপেক্ষা করতে পারে। তাকে ছাড়া অন্য কাউকে আমি চাই না, কারণ সম্ভবত এই যে তারই কল্যাণে আমি বুঝতে পেরেছি একটি সহজ সরল সত্য। সত্যটা এই যে তথাকথিত অলৌকিক ব্যাপারকে নিজের হাতে সাধন করতে হবে। কোন লোকের কাছে যদি বড় কথা হয়, পরম মূল্যবান হয় তামার পয়সা পাওয়া, তবে সেটা দেওয়া কঠিন নয়, কিন্তু অন্তরে যখন লালিত হয় জ্বলন্ত কোন কিছুর বীজ—অলৌকিকতা, তখন তোমার সাধ্য থাকলে তার জন্য সেই অলৌকিকতাকে সত্য করে তোল।

"তার মন প্রাণ নতুন হবে, তোমারও হবে। জেলের বড়কর্তা নিজেই যখন জেলখানা থেকে কয়েদীকে ছেড়ে দেবে, যখন কোটিপতি তার কেরাণিকে ভিলাবাড়ি, প্রহসনগীতির গায়িকা আর লোহার সিন্দুক উপহার দেবে, যখন বারবার ব্যর্থ অন্য এক ঘোড়াকে আগে যেতে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কোন জকি অন্তত একবার হলেও নিজের ঘোড়াকে লাগাম টেনে আটকে রাখবে, তখন সকলে বুঝতে পারবে ব্যাপারটা কত মধুর, এত চমৎকার যে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু আরও কিছু ঘটনা আছে যেগুলো কোন অংশে কম

অলৌকিক নয়: হাসি, আমোদ, ক্ষমা, আর ঠিক সময়ে ঠিক কথাটি বলা। এটা আয়ত্তে
আনার অর্থ সব কিছু আয়ত্তে আনা। আমার কথা যদি বলি, আমাদের—মানে, আমার আর আসলের সূচনাপর্ব চিরকালের জন্য গাঁথা হয়ে থাকবে রাঙা পালের ঝলকানিতে, আর সে পাল সৃষ্টি হয়েছে হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে, যে হৃদয় জানে কাকে বলে ভালোবাসা। আমার কথা আপনি বুঝতে পারলেন কি?"

"হ্যাঁ ক্যাপ্টেন," নিখুঁত ভাঁজ-করা পরিষ্কার রুমাল দিয়ে গোঁফজোড়া মুছে গলা খাঁকারি দিয়ে বলল প্যাণ্টেন। "আমি সব বুঝেছি। আপনি আমার মনকে নাড়া দিয়েছেন। নীচে গিয়ে এখন নিক্সের কাছে ক্ষমা চাইব। গতকাল একটা বালতি জলে ডুবিয়ে দিয়েছিল বলে ওকে আমি বকাবকি করি। ওকে আমি তামাক দেব — তাস খেলে নিজের তামাক ও হারিয়েছে।"

গ্রে তার নিজের কথার এরকম দ্রুত, হাতে-নাতে ফল দেখে খানিকটা আশ্চর্যই হয়ে যায়, কিন্তু সে মুখ ফুটে কিছু বলার আগেই প্যাণ্টেন দুমদাম শব্দে ল্যাডার বয়ে নীচে নেমে গেল, দূরে কোন এক জায়গায় গিয়ে সে ভারী নিশ্বাস ফেলল। গ্রে ফিরে তাকাল ওপরের দিকে: তার মাথার ওপর নীরবে উড়ছে রাঙা পালের মেলা; পালের সেলাইয়ের ফাঁকে ফাঁকে জ্বলজ্বল করছে সূর্যের রক্তিম আভা। 'সিক্রেট' তীরভূমি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, চলেছে সমুদ্রের দিকে। গ্রের গুঞ্জরিত হৃদয়ে সন্দেহের ছিটেফোঁটা ছিল না, ছিল না উদ্বেগের চাপা আঘাত, ছোটখাটো দুশ্চিন্তার সাড়াশব্দ; পালের মতোই শান্ত ভাবে সে ছুটে চলেছে রোমাঞ্চকর লক্ষ্যের দিকে, তার মন এমন সমস্ত চিন্তাভাবনায় ভরপুর যা ভাষাকে ছাড়িয়ে যায়।

দুপুর নাগাদ দিগন্তে দেখা দিল যুদ্ধজাহাজের চিমনির ধোঁয়া। যুদ্ধজাহাজ তার গতি পরিবর্তন করল এবং আধ মাইল দূর থেকে 'স্রোতের টানে ভাসার' সঙ্কেত দিল।

গ্রে বলল, "শোন ভাই, নাবিকেরা, ওরা আমাদের ওপর গুলিগোলা ছুঁড়বে না। ভয়ের কোন কারণ নেই। আসলে ওরা নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না।"

গ্রে স্রোতের টানে ভাসানোর নির্দেশ দিল। যেন আগুন লেগেছে এই ভাবে চিৎকার করে প্যাণ্টেন 'সিক্রেটকে' বায়ুর গতি থেকে সরিয়ে আনল; জাহাজ থেমে যেতে যুদ্ধজাহাজটা থেকে ছুটে এলো একটা স্টীম লঞ্চ। স্টীম লঞ্চে একদল নাবিক আর হাতে সাদা দস্তানা পরা একজন লেফটেনাণ্ট। জাহাজের ডেক-এ নামার পর লেফ্টেনাণ্ট আশ্চর্য হয়ে চারদিকে দৃষ্টিপাত করলেন, পরে গ্রের সঙ্গে কেবিনে গেলেন এবং সেখান থেকে এক ঘণ্টা বাদে অদ্ভুত ভাবে হাত নাড়া দিয়ে যখন হাসতে হাসতে ফের রওনা দিলেন নীল যুদ্ধজাহাজের দিকে তখন দেখে মনে হচ্ছিল যেন তাঁর সদ্য পদোন্নতি হয়েছে। সাদাসিধে মানুষ প্যাণ্টেনকে নিয়ে গ্রের যা অবস্থা হয়েছিল, এবারে মনে হল সে তার চেয়ে বেশি সাফল্য অর্জন করেছে, কেননা যুদ্ধজাহাজটা গতি সামান্য মন্থর করে দিয়ে গ্রেকে অভিনন্দন জানিয়ে দিগন্তের দিকে প্রবল গর্জনে তোপ দাগল। বিশাল বিশাল ঝলমলে গোলা বায়ু ভেদ করে প্রচণ্ড বেগে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছিল শান্ত জলের উপর। সারা দিন ধরে যুদ্ধজাহাজে বিরাজ করল এক রকমের আধা উৎসবের বিহ্বলতা; লোকজনের মেজাজ কাজের উপযোগী ছিল না, তাদের মেজাজে প্রকাশ পেল পরম

 বিস্ময় — প্রেমের জন্য পরম বিস্ময়, আর সে প্রেমের কথা চলতে থাকে সর্বত্র — অফিসারদের মেস থেকে শুরু করে ইঞ্জিনঘর পর্যন্ত। একজন নাবিক টর্পেডো-বিভাগের পাহারাদারের পাশ দিয়ে যেতে সে তাকে ধরে জিজ্ঞেস করল:

"আচ্ছা টম, তোর বিয়ে হয় কী করে?"

"ও যখন জানলা দিয়ে লাফ মেরে আমার কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়ার মতলব করে তখন আমি খপ করে ওর স্কার্ট চেপে ধরি," এই বলে টম সগর্বে গোঁফে তা দিল।

কিছুক্ষণের জন্য 'সিক্রেট' তীর থেকে দূরে সরে গিয়ে ফাঁকা সমুদ্রের ওপর দিয়ে চলল; দুপুর নাগাদ দূরের তীরভূমি দেখা দিল। টেলিস্কোপ নিয়ে গ্রে দৃষ্টিনিক্ষেপ করল কাপের্ণার দিকে। সারি সারি চাল যদি না থাকত তা হলে সে একটা বাড়ির জানলায় একটা বই হাতে আসলকে বসে থাকতে দেখতে পেত। আসল বই পড়ছিল; পৃষ্ঠা বয়ে ঘুরঘুর করে হাঁটছিল ছোট্ট একটা সবুজেটে পোকা। পোকাটা থেকে থেকে থামছিল, সামনের পায়ে ভর দিয়ে সামান্য উঠে দাঁড়াচ্ছিল, তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন স্বাধীন, গৃহপালিত। ইতিমধ্যেই দু দুবার বেশ বিরক্তির সঙ্গে ওটাকে ফুঁ দিয়ে জানলার তাকে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেখান থেকে আবার অসন্দিগ্ধ চিত্তে, স্বচ্ছন্দে ফিরে এসেছে, যেন তার কিছু বলার আছে। আসল যে-হাতে পৃষ্ঠার কোনা ধরে ছিল এবারে পোকাটা প্রায় সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল; এখানে সে 'দেখ' শব্দটার ওপরে গিয়ে আটকে গেল, সন্দেহবশত থমকে দাঁড়াল নতুন করে ঝড়ের আশঙ্কায়, আর সত্যি—তাই, কোন গতিকে অপ্রীতিকর অবস্থা থেকে রেহাই পেয়ে গেল, কেননা আসল ইতিমধ্যে চেঁচিয়ে বলে উঠেছে: "আবার সেই পোকাটা... আহাম্মক কোথাকার।" আর আগন্তুকটিকে ফুঁ দিয়ে ঘাসের মধ্যে ফেলে দেওয়ার দৃঢ় সঙ্কল্পও সে করে বসেছিল, কিন্তু এমন সময় দৈবাৎ এক ছাদ থেকে আরেক ছাদে দৃষ্টি ঘুরতে ঘুরতে প্রশস্ত রাস্তার ফাঁকে নীল সমুদ্রের ফালির ওপর সে দেখতে পেল রাঙা পালতোলা এক সাদা জাহাজ।

সে চমকে উঠল, আঁতকে পিছু হটে গেল, আড়ষ্ট হয়ে গেল; তারপর সে ঝট করে লাফিয়ে উঠল, একটা প্রেরণার ধাক্কায় অসংযত অশ্রুর বন্যা বইয়ে দিল, তার হৃৎপিন্ড এমন ভাবে আছাড় খেল যে মাথা ঘুরিয়ে দিল। 'সিক্রেট' এই সময় একটা ছোট অন্তরীপ ঘুরে যাচ্ছিল, তার বাঁ ধারের কোনা ছিল তীরভূমির ধার ঘেঁষে; রাঙা রেশমের আগুনের নীচে সাদা ডেক-এর নীল তলদেশে প্রবাহিত হয়ে চলছিল মৃদু সঙ্গীত; "ভর গো সুরার পাত্র ভর, বন্ধুরা এসো পান কর, প্রেমের নামে..."—এই সুপরিচিত কথাগুলির মধ্যে সঙ্গীতের তাল-লয়ের প্রবাহ খুব একটা সাফল্যের সঙ্গে প্রকাশ পাচ্ছিল না। তার সারল্যের মধ্যে উল্লসিত হয়ে পাক খাচ্ছিল, গমগম আওয়াজ করছিল তরঙ্গ।

আচ্ছন্নের মতো বাড়ি ছেড়ে, ঘটনার অপ্রতিরোধ্য বায়ু প্রবাহে তাড়িত আসল তক্ষুনি ছুটল সমুদ্রের দিকে। প্রথম কোনায় সে প্রায় শক্তি হারিয়ে থমকে দাঁড়াল; তার হাঁটু খুলে আসছিল, তার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে লাগল, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল, চেতনা ঝুলছিল যেন একটা সূক্ষ্ম সুতোয়। মনোবল হারানোর ভয়ে দিশেহারা হয়ে সে মাটিতে পা ঠুকল, ধাতস্থ হয়ে নিল। থেকে থেকে কখনও ছাদ, কখনও বেড়া তার দৃষ্টি থেকে আড়াল করছিল রাঙা পাল; তখন পাছে কোন সাধারণ মরীচিকার মতো পালগুলি

অদৃশ্য হয়ে যায় এই ভয়ে সে পীড়াদায়ক বাধা অতিক্রম করার জন্য তাড়াতাড়ি পা চালাল
এবং আবার জাহাজটি দেখতে পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে দাঁড়াল।

এই সময় কাপের্ণায় এমন হুলস্থুল, এমন চাঞ্চল্য, সর্বসাধারণের মধ্যে এমনই একটা বিভ্রান্তি দেখা দিল যা বড় বড় ভূমিকম্পের প্রতিক্রিয়ার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। এখানকার তীরভূমিতে এর আগে আর কখনও বড় জাহাজ এসে ভেড়ে নি। জাহাজটির ছিল হুবহু সেই রাঙা পাল যার নামে ধ্বনিত হত ঠাট্টা বিদ্রূপ; এখন সেই রাঙা পাল অস্তিত্ব ও সুস্থ জ্ঞানবুদ্ধির সমস্ত নিয়মকানুনকে নস্যাৎ করে দিয়ে একটা নেহাৎই নিরীহ ঘটনার মতো স্পষ্ট ও অকাট্য রূপে ঝলমল করছে। মেয়ে-পুরুষ আর শিশুরা যে যেই বেশে ছিল পড়িমরি ছুটল পাড়ের দিকে। অধিবাসীরা এক উঠোন থেকে আরেক উঠোনে একে অন্যকে ডাকাডাকি করতে লাগল, এ ওর গায়ে ধাক্কা খেল, হাউমাউ করে উঠল, মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে জলের সামনে ভিড় জমে গেল, আর সেই ভিড়ের মধ্যে তীরবেগে এসে প্রবেশ করল আসল।

সে ওখানে আসার আগেই লোকজনের মুখে মুখে বিষণ্ণ ও স্নায়ুবিকারগ্রস্ত উৎকণ্ঠা আর ঘৃণামিশ্রিত ভীতির সুরে উচ্চারিত হতে থাকে তার নাম। কথা বেশির ভাগই বলে পুরুষেরা; মেয়েরা স্তম্ভিত হয়ে সাপের মতো হিসহিস করে চাপা গলায় ফুঁসতে থাকে; আর ওদের কেউ যদি বকুনি শুরু করত তাহলে দেখেশুনে মনে হত যেন তার মাথায় বিষ চড়ে গেছে। আসলের আবির্ভাব হওয়া মাত্র সকলে চুপ করে গেল, সকলে আতঙ্কে তার কাছ থেকে দূরে সরে গেল, তখন সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে, সুখাবেশে, সলজ্জ ভঙ্গিতে একা দাঁড়িয়ে রইল উত্তপ্ত, শূন্য বালুকা প্রান্তরে। তার মুখ তার সেই পরমাশ্চর্যের চেয়ে কম আরক্ত ছিল না। সে অসহায় ভাবে দুহাত বাড়িয়ে দিল উঁচু জাহাজটার দিকে।

জাহাজ থেকে আলগা হয়ে বেরিয়ে এলো একটা নৌকো। নৌকোয় রোদে পোড়া মাল্লাদের ভিড়, আর তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সেই লোকটি, যাকে, এখন আসলের মনে হচ্ছে যেন আগে থাকতেই জানে, যেন ছোটবেলার অস্পষ্ট স্মৃতির মতো মনে পড়ছে। লোকটি তার দিকে তাকিয়ে যে ভাবে হাসল তাতে উষ্ণতার স্পর্শ, দ্রুত গতিতে চলার আহ্বান। কিন্তু শেষ মুহূর্তে হাস্যকর হাজার হাজার ভীতি আসলের ওপর চেপে বসল। ভুলভ্রান্তি, ভুল বোঝা, গোপন ও ক্ষতিকর প্রতিবন্ধকতা—সমস্ত কিছুর ভয়ে মারাত্মক ভীত হয়ে সে দৌড়ে কোমরসমান ইষদুষ্ণ জলের আন্দোলনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে চেঁচিয়ে বলল: "আমি এখানে, আমি এখানে! এই যে আমি!"

তখন ৎসিমার বেহালায় ছড় টানল — আর সেই একই সুর এসে আছড়ে পড়ল জনতার স্নায়ুতন্ত্রীর ওপর, কিন্তু এবারে তা ছিল পূর্ণাঙ্গ, উৎসবমুখর কোরাসসঙ্গীত। উত্তেজনায়, মেঘ আর তরঙ্গমালার চলাফেরা, জল আর দূরপ্রান্তের ঝিকিমিকির দরুন আসল এখন প্রায় ঠাহরই করতে পারছিল না কী নড়ছে -- সে নিজে, জাহাজ, না নৌকো — সব কিছু নড়ছিল, পাক খাচ্ছিল, পড়ে যাচ্ছিল।

কিন্তু ঝপ্ করে দাঁড় জল ছিটকে দিল তার কাছাকাছি; সে মাথা তুলল। গ্রে ঝুঁকে পড়তে আসল দুহাতে তার কোমরবন্ধনী আঁকড়ে ধরল। আসল চোখ বুজে ফেলল,

 তারপর তাড়াতাড়ি চোখ খুলে তার উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে সাহসে ভর করে হাসল, দম নিতে নিতে বলল:

"হুবহু সেই রকম!"

"আর তুমিও তাই গো!" মহামূল্যবান সিক্ত সম্পদকে জল থেকে তুলতে তুলতে গ্রে বলল। "এই আমি এসেছি। তুমি আমাকে চিনতে পারলে কি?"

আসল তার কোমরবন্ধনী আঁকড়ে ধরে থেকে মাথা ঝাঁকাল, নতুন আত্মার জাগরণে ও শিহরনে তার চোখ বুজে এলো। নরম তুলতুলে একটা বিড়ালছানা হয়ে সুখ তার মন অধিকার করে ছিল। আসল যখন চোখ খুলবে বলে ঠিক করল তখন নৌকোর দুলুনি, তরঙ্গের ঔজ্জ্বল্য, প্রচণ্ড শক্তিতে নড়েচড়ে সামনে এগিয়ে আসা 'সিক্রেটের' পাশ — সবই মনে হল যেন স্বপ্ন, যেখানে আলো আর জল দুলছে, ঘুরপাক খেয়ে চলছে যেন মেতে উঠেছে দেওয়ালের ওপর নড়েচড়ে বেড়ানো সূর্যের প্রতিফলন ধরার খেলায়। সে স্মরণ করতে পারল না কী ভাবে গ্রের শক্ত দুহাতে বাহিত হয়ে গ্যাংপ্ল্যাঙ্ক দিয়ে ওপরে উঠল। জাহাজের ডেক্-এর ওপরে আর পাশে ছেয়ে দেওয়া হয়েছে গালিচা, পালের রাঙা ছটায় ডেকটাকে মনে হচ্ছিল যেন স্বর্গোদ্যান। শিগগিরই আসল দেখতে পেল যে সে দাঁড়িয়ে আছে কেবিনে — একটা ঘরে, যার চেয়ে ভালো ঘর আর হতেই পারে না।

তখন ওপর থেকে আবার প্রবল শব্দে সঙ্গীত উৎসারিত হয়ে বিজয়দৃপ্ত উল্লাসে বুক কাঁপিয়ে দিল, ভরে দিল। আসল আবার চোখ বুজল — তার ভয় হচ্ছিল পাছে সে তাকানোমাত্রই সমস্ত কিছু অদৃশ্য হয়ে যায়। গ্রে তার হাত ধরল; কোথায় নিরাপদে যাওয়া যেতে পারে ইতিমধ্যে তা বুঝতে পারার ফলে আসল অশ্রুসিক্ত মুখ লুকাল তার বন্ধুটির বুকে, যার আবির্ভাব ঘটেছে এমন অলৌকিক উপায়ে। অন্য কারও পক্ষে অগম্য, ভাষার অতীত, মহামূল্যবান মুহূর্ত সূচিত হওয়ায় গ্রে নিজে অভিভূত ও বিস্মিত হয়ে সন্তর্পণে অথচ হাসতে হাসতে অনেক-অনেক কালের স্বপ্নদৃষ্ট এই মুখটি চিবুক ধরে ওপরে তুলল; তরুণীর চোখ শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি খুলে গেল। সে চোখে ঝরে পড়ছিল মানুষের যাবতীয় সদগুণ।

"আমার লংগ্রেনকে কি তুমি আমাদের সঙ্গে নেবে?" সে বলল।

"হ্যাঁ, নেব।" গ্রে তার সুদৃঢ় "হ্যাঁ" কথাটির পরেই আসলকে এমন গাঢ় চুম্বন দিল যে আসল খিলখিল করে হেসে উঠল।

এখন ওদের কাছ থেকে আমাদের একটু সরে যেতে হয়, কেননা আমরা জানি যে ওদের নিরিবিলিতে থাকা দরকার। জগতে নানা ভাষায়, নানা উপভাষায় কতই না শব্দ, কিন্তু ঐ দিন তারা একে অন্যকে যে কথা বলে তাদের সবগুলি দিয়েও তার কণামাত্র প্রকাশ করা যাবে না।

ইতিমধ্যে ডেক্-এর ওপর, প্রধান মাস্তুলের গোড়ায় পিপের পাশে অপেক্ষা করছিল গোটা নাবিকদল। পিপের গা পোকায় খাওয়া, তার ঢাকনা ভেঙে ফেলায় প্রকাশ পেয়েছে শতবর্ষের গাঢ় ঐশ্বর্য। অ্যাটউড্ দাঁড়িয়ে ছিল; প্যান্টেন বাধ্য ছেলের মতো বসে ছিল, তাকে দেখাচ্ছিল নবজাত শিশুর মতো উদ্ভাসিত। গ্রে ওপরে উঠে অর্কেস্ট্রাকে সঙ্কেত

দিল এবং মাথার টুপি খুলে সোনালি শিঙার বাজনার তালে তালে গেলাস ডুবিয়ে প্রথম তুলল পবিত্র সুরা।

নিঃশেষে পান করে গেলাস ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে বলল, "এই ত।... এবারে পান করুন, সবাই পান করুন, যে পান করে না সে আমার শত্রু।"

এই কথাগুলি তাকে দ্বিতীয়বার বলতে হল না। এই সময় সমস্ত পাল ফুলিয়ে পুরো বেগে 'সিক্রেট' যখন চিরকালের জন্য হতচকিত কাপের্ণা থেকে সরে যাচ্ছিল তখন পিপের চারধারে এমন ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে গেল যে বড় বড় উৎসবের সময় যেভাবে ঠেলাঠেলি হয় এ তার সমস্ত কিছুকে ছাড়িয়ে যায়।

"মদটা তোমার কেমন লাগল?" গ্রে জিজ্ঞেস করল লেতিকাকে।

নাবিক সঠিক শব্দের সন্ধান করতে করতে বলল, "ক্যাপ্টেন, আমি তার মনঃপুত হয়েছি কিনা জানি না, তবে অভিজ্ঞতাটা নিয়ে আমাকে ভালোমতো ভাবনাচিন্তা করা দরকার। মৌচাক আর ফলবাগিচা!"

"কী?"

"আমি বলতে চাই, আমার মুখে যেন কেউ মৌচাক আর ফলের বাগান গুঁজে দিয়েছে। সুখী হোন ক্যাপ্টেন। আর সুখী হোন তিনি যাঁকে আমি বলব 'সিক্রেটের' 'সেরা মাল', সেরা পুরস্কার!"

পর দিন যখন ভোরের আলো ফুটতে লাগল তখন জাহাজ কাপের্ণা থেকে অনেক দূরে। নাবিকদের একটা অংশ গ্রের মদের প্রভাবে যেমন ডেক্-এর ওপর ঘুমিয়ে পড়েছিল, তেমনি সেখানে পড়ে রইল। পা ঠিক ছিল কেবল কাণ্ডারীর আর পাহারাদারের, এ ছাড়া ছিল ৎসিমারের। সে গভীর চিন্তায়, নেশায় বুঁদ হয়ে বসে ছিল জাহাজের পেছনের দিকে, ভায়োলিনচেল্লোর তারের ঘাট ঠেকিয়ে রেখেছে চিবুকের সঙ্গে। সে বসে বসে মৃদু ছড় টেনে যাচ্ছিল, তাতে তারে ফুটে উঠছিল মায়াবী, অপার্থিব কণ্ঠস্বর। সে ভাবছিল সুখের কথা।...

১৯২০-১৯২১



সাপ

'নেড্ গার্লানের উত্তরাধিকারী' — পরিচিত লোকেরা ঠাট্টা করে ওদের এই আখ্যাই দিয়েছিল — ছিল সাতজন অল্পবয়সী ছাত্রছাত্রী, গার্লানেরই দেওয়া একটা মোটরবোটের যৌথ মালিক। গার্লান ক্ষয়রোগে সুইজারল্যান্ডে দেহত্যাগ করে।

জুলাইয়ের মাঝামাঝি 'উত্তরাধিকারীদের' প্রথম ভ্রমণ শুরু হল। তারা বন্য জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে স্নার্ক হ্রদের তীরের দিকে যাত্রা করল।

অষ্টম একজন ব্যক্তি আমন্ত্রিত হয়েছিল — কোলবেয়র। যে ক'টি মেয়ে এই ভ্রমণে চলেছে তাদেরই একজন -- জয় টেভিসের প্রতি কোলবেয়রের অসুখী প্রেম এক বছর আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং প্রায়ই মন্তব্যের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

ষোল বছর বয়স থেকে শুরু করে আজ অবধি জয় টেভিস একের পর এক ক্ষত সৃষ্টি করে গেছে, কিন্তু যেহেতু ক্ষত নিরাময়ের ক্ষমতা কিংবা ইচ্ছেও তার ছিল না সেই হেতু চিকিৎসকের সহায়তা ছাড়াই সেগুলি বেশ তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। কোলবেয়র কিন্তু অন্যদের তুলনায় বেশ মারাত্মক রকমের জখম হয়, আর এ ব্যাপারটা সে গোপনও করত না।

সে জয়কে তিন বার তার প্রস্তাব নিবেদন করে; প্রথমে হাসির উদ্রেক করে, পরে প্রকাশ পায় 'বন্ধু' হিসেবে গ্রহণের ইচ্ছা এবং অবশেষে খোলাখুলি বিরক্তি। তাকে জয়ের ভালো লাগে নি। সিরিয়াস স্বভাবের যে-সমস্ত লোক একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে এবং যারা প্রেমে পড়ে উদাস-উদাস হয়ে যায় তাদের সে ভয় করত। এ রকম অতি সংযত প্রকৃতির কোন লোক তার স্বামী হতে পারে একমাত্র এই চিন্তাই অদৃষ্টগোচর জোরাজুরির কথা ভেবে তাকে প্রবল উত্তেজিত প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তোলা।

কিন্তু কোলবেয়র নাছোড়বান্দা ধরনের ছিল না, জয়ও তাকে এড়িয়ে চলত না, প্রথমেই তার কাছ থেকে কথা আদায় করে দিয়েছিল যে সে তাকে আর প্রস্তাব নিবেদন করবে না। কোলবেয়র তার কথা মেনে নিল এবং এমন আচরণ করতে লাগল যেন কখনই "জয়, আমার স্ত্রী হও!" — এই সাধারণ কথাগুলি বলে তাকে ঘাঁটায় নি।

'বন্য জীবনের' তৃতীয় দিন বনের ভেতরে যাবার বাসনা জয়ের হল, সে কোলবেয়রকে তার সঙ্গী হওয়ার আমন্ত্রণ জানাল; তার মনে এরকম একটা ক্ষীণ আশা ছিল যে আর প্রস্তাব নিবেদন না করার যে প্রস্তরকঠিন প্রতিশ্রুতি কোলবেয়র দিয়েছিল এর ফলে তা ভঙ্গ করার একটা অজুহাত সে পাবে। আজ তিন মাস হল একটি ভালোবাসার কথা কেউ তাকে বলে নি। তার ইচ্ছে হচ্ছিল এমন কোন ছোটখাটো ঘটনা ঘটে যা প্রেমেরই মতো, অথচ ক্ষণিক ও সম্পূর্ণ নিরাপদ মনোভাবের উদ্রেক করে। কোলবেয়র যখন পেছন পেছন চলতে লাগল তখন জয়ের মনে হচ্ছিল পেছন থেকে যেন একটা পতনোন্মুখ দেয়াল ভয়ে ভয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। উপযুক্ত মুহূর্তটি আঁচ করে এক পাশে সরে দাঁড়ালেই হল — দেয়াল ভেঙে পড়বে ফাঁকা জায়গার ওপর।

 তারা বনের ভেতরে এক ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এলো। সেখানে লম্বা লম্বা ঘাস, আর ইতস্তত ছড়িয়ে আছে পাথর। তারা দুজনে পাথরের ওপর গিয়ে বসল, ভাবতে লাগল যার যার নিজের ভাবনা।

কোলবেয়র মন্তব্য করল যে খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে ফেরা দরকার।

"আমাদের সম্পর্ক যে সাধারণ সম্পর্ক হয়েছে, এতে কি আপনি খুশি?" খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর জয় বলল।

"আমার মনে হয় এই প্রশ্ন আর উঠতে পারে না," কোলবেয়র সন্তর্পণে জবাব দিল, সঙ্গত কারণেই এর মধ্যে একটা প্যাঁচ আছে বলে সে মনে মনে সন্দেহ করল। "আমি কথা দিয়েছি। অবশ্য, যদি..."

"না," জয় তার কথা শেষ না করতে দিয়ে বলে উঠল, "আমি আপনাকে আগেই বারণ করে দিয়েছি, আর আপনিও কথা দিয়েছেন। আপনি কি আপনার প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গতে চান?"

"মরে গেলেও না," কোলবেয়র প্রত্যুত্তরে গম্ভীর ভাবে বলল, "যে প্রতিশ্রুতি আপনাকে আমি দিয়েছি তা ভাঙ্গছি না। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন।"

জয় বিরক্ত হয়ে তার দিকে তাকাল। কোলবেয়র বসে বসে এমন বিনীত ভঙ্গিতে ও বিষণ্ণ ভাবে হাসছিল যে জয়ের বিরক্তি পরিণত হল প্রবল বিতৃষ্ণায়। তার চালাকি খাটল না।

আর এগোনোর অর্থ হল নিজেকেই হাস্যকর পরিস্থিতির মধ্যে ফেলা। কিছুক্ষণ সে অপেক্ষা করল, তার তখনও আশা ছিল যে কোলবেয়র ধৈর্য ধারণ করতে না পেরে শিগ্‌গিরই কথা বলবে, কিন্তু কোলবেয়র কেবল অন্যমনস্ক ভাবে ঘাসের ডাঁটা দুই হাতের তালুর মাঝখানে পাকাচ্ছিল। জয়ের হঠাৎ মনে হল যে এই লোকটা তার গোটা চেহারা, নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা নিয়ে তাকে যেন একটা শিক্ষা দিচ্ছে, তাই তার প্রতি এমন একটা প্রবল বিদ্বেষের ভাব মনে জেগে উঠল যে সে খোঁচা দিয়ে না বলে পারল না:

"আপনি কথা দিয়েছেন কাপুরুষতার বশে। চুপ করে বসে থাকা অনেক নিরাপদ বটে, তাই না?"

কোলবেয়র উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, "জয়, আপনার ওপর গরমের প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে। চলুন ফিরে যাওয়া যাক, ওখানে আপনি ছায়ায় বসতে পারবেন।"

জয় উঠে দাঁড়াল। তার ইচ্ছে হচ্ছিল কটা ধরনের, ঘন চুলের মুঠো চেপে অনেকক্ষণ ধরে ঝাঁকাতে থাকে এই ভারী মাথাটা, যার ভেতরে খেলার কোন অর্থই ঢোকে না। তার খামখেয়ালী মেজাজে সাড়া দেওয়ার প্রবৃত্তি লোকটার ছিল না। তরুণী গভীর উত্তেজনায়, অপমানে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে নিজের পায়ের নীচের মাটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। ঘাসের ভেতর সরসর আওয়াজ করে কী যেন একটা ঝলকে উঠল — তার দৃষ্টি সেখানে গিয়ে পড়ল।

"দেখুন, টিকটিকি!"

কোলবেয়রের ধাক্কা খেয়ে সে প্রায় উল্‌টেই পড়ে গিয়েছিল। টলতে টলতে সে অতি কষ্টে নিজের পায়ে খাড়া হয়ে রইল। কোলবেয়র দুহাত নাড়তে নাড়তে ঘাসের ভেতরে

কিছু একটা পায়ে মাড়াচ্ছিল, তারপর আলগোছে বসে পড়ে একটা ছোট্ট সাপকে শরীরের মধ্যভাগ ধরে সন্তর্পণে তুলল, সাপটার শরীরের দুটি প্রান্ত — মাথা আর লেজ দুদিকে ঝুলতে লাগল।

"এটাই কি আপনি দেখতে পেয়েছিলেন?" জয়ের ক্রুদ্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত হয়ে সে বলল। "আমি যদি আপনাকে জোরে ধাক্কা দিয়ে থাকি তার জন্যে ক্ষমা করবেন। এক ধরনের তামাটে সাপ! যত রকমের মারাত্মক সাপ আছে তাদেরই একটা জাত। মেয়েরা প্রায় সব সময়ই সাপকে টিকটিকি বলে ভাবে। এই সাপের কামড়ে লোকে তিন মিনিটের মধ্যে মারা যায়।"

জয় আরও কাছে এগিয়ে এলো।

"ওটা কি মরা?"

"মরা," সাপটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার তুলে নিয়ে জবাব দিল কোলবেয়র।

জয়ের মতে, মরা সাপ হাতে তুলে নেওয়া একটা সাহসের কাজ, তাই এ ব্যাপারে কোলবেয়র যে টেক্কা মেরে যাবে সেটা তার সহ্য হল না। ওর হাত থেকে সাপটা নিয়ে জয় তাকে নিজের বাঁ হাতের মণিবন্ধে এমন ভাবে জড়াল যে তা দেখতে হল ব্রেসলেটের মতো। কোলবেয়রের জুতোর হিলে জায়গায় জায়গায় থেঁতলানো সাপটা জয়ের রোদেপোড়া চামড়ার ওপর পুরনো সোনার রঙের দীপ্তি দিতে লাগল।

"ফেলে দিন! ফেলে দিন!" কোলবেয়র চেঁচিয়ে উঠল।

সে বলার অবকাশ পেল না যে সাপটার নিষ্প্রাণ শরীরে মৃদু খিঁচনির লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। সাপটা মুহূর্তের মধ্যে সজীব হয়ে উঠেছে এবং মানুষের হাতের শত্রুভাবাপন্ন উষ্ণতার স্পর্শ পাওয়ামাত্র ফণা তুলে জয়ের হাতে ছোবল মারল। এই প্রয়াসের ফলে তার সম্পূর্ণ প্রাণনাশ হল। কোলবেয়র তার মাথাটা ধরে এমনভাবে চেপে ধরল যে সেটা ছিঁড়ে গেল, তারপর জয়ের হাত থেকে শরীরের বাকি অংশটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার পর দেখতে পেল দু ফোঁটা রক্ত। কোলবেয়রের কাছে এর অর্থ চিৎকার করে বলার মতোই স্পষ্ট।

"মাথা ঠিক রাখুন!" সে বলল। "মনে রাখবেন মৃত্যু এখানে।"

তার শরীর কাঁপতে লাগল যদিও সে চেষ্টা করছিল কাঁপুনি সংযত করে রাখতে। জয় অসহায় ভাবে নিজের ছোবল খাওয়া হাতটার দিকে তাকাচ্ছিল। সে একটা বিশ্রী রকমের ব্যথা অনুভব করছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে আসার চিন্তা কোলবেয়রের মতো অত তাড়াতাড়ি তখনও তার কল্পনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে নি। কিন্তু কোলবেয়র যে বড় রকমের সেবাকর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিল তার ফলে, কোলবেয়রের অপ্রত্যাশিত আচরণে ও খবরদারিতে সমগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে বিপদগ্রস্ত অনুভব করে সে সচেতন হয়ে পড়ল।

"ছেড়ে দিন," ঘন ঘন নিশ্বাস নিতে নিতে সে বলল। "আমি নিজেই পারব। আমাকে ছুরিটা দিন।"

এরকম একটি মুহূর্তে সময়ের দাম জীবনের চেয়ে বেশি। ছুরিটা খুলে কোলবেয়র অপারেশন করার উদ্দেশ্যে জয়কে মাটিতে ফেলে দেবার চেষ্টা করছিল।

 সঙ্গে সঙ্গে সে দ্রুত নিজের দাঁতের মাড়ি ও তালুতে জিভ বুলিয়ে নিল মুখের ভেতরে কোন আঁচড় আছে কিনা স্থির করার জন্য।

"বিষ শুষতে হবে।" সে চেঁচিয়ে বলল। "আর কিছুতে কোন কাজ হবে না! জয়, তর্ক করবেন না!"

চুপচাপ, দাঁতে দাঁত চেপে জয় তার সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে চলল। নিজের অদ্ভুত ক্ষিপ্ত স্বভাবের দরুন জয়ের মনে হচ্ছিল এই লোকটার হাত থেকে জীবন গ্রহণের চেয়ে মরাও ভালো। তার ভালো ভাবেই জানা ছিল ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে শেষ হতে পারে। কোলবেয়রের এখন সুযোগ দেখা দিয়েছে তার স্বামী হওয়ার — কোন কথা উচ্চারণ না করে, কোন রকম ভাবনাচিন্তা ছাড়াই নিজের সহজাত প্রবৃত্তিবশে এটা উপলব্ধি করে সে কোলবেয়রের দুহাতের বন্ধনের মধ্যে মরিয়া হয়ে ছটফট করতে লাগল। কোলবেয়র ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে পড়ল, তাকে একটা গাছের দ্বিধাগ্রস্ত কাণ্ডের দিকে টেনে নিয়ে গেল, দুই কাণ্ডের ফাঁকের মধ্যে তার হাত জোর করে গুঁজে দিল, টানা হেঁচড়া করতে গিয়ে জয়ের হাতের ছালও ছড়ে গেল। এরপর সে ঘুরে অন্য দিকে গিয়ে দাঁড়াল। এখানে সে জয়ের মণিবন্ধ চেপে ধরল। এবারে জয়ের হাত সাঁড়াশীবন্ধনে আটকা পড়ল।

এই হাতটার — কোলবেয়রকে যে হাতটা ঘৃণা করত, তার কনুইয়ের কাছাকাছি জায়গায় সে প্রবল চাপ দিল, এত জোরে চাপ দিল যে জয়ের নখ নীলচে হয়ে উঠল। কোলবেয়র ছোবলের জায়গার মাংসে গভীর কামড় বসিয়ে দিল, ক্ষতস্থানে ঠোঁট লাগিয়ে মুখ ভরে রক্ত টেনে নিল। থুতু করে রক্ত ফেলে দিয়ে সে আবার ঐ কাজ করল এবং একটু দম নিয়ে তৃতীয় বার তার প্রিয় তরুণীর রক্ত চুষল। কয়েকবার হেঁচকা টানে হাত সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করার পর জয় শান্ত হয়ে গেল। সে অন্য পাশে, গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আতঙ্কে, লাঞ্ছনায় ও ক্রোধে তিক্ত চোখের জলে তার মুখ ভেসে গেল। সে বলল:

"যাই বলুন না কেন কোলবেয়র, আপনার স্ত্রী আমি কখনই হতে যাচ্ছি না। আমাকে ছেড়ে দিন!"

কোলবেয়র চুপ করে রইল। অবশেষে তার হাত ছেড়ে দেওয়ার পর সে কী বলছে বুঝতে পেরে, কোলবেয়র জবাব দিল:

"আপনি কারও না কারও হবেন, এটা বড় কথা। আর স্ত্রী হতে গেলে বাঁচা দরকার।"

কোলবেয়রের গোঁফ আর চিবুক রক্তে মাখামাখি, সে হাত দিয়ে গোঁফ আর চিবুক মুছল, কিন্তু তার হাতও রক্তে লাল।

জয় তার ক্ষতবিক্ষত, আহত হাতটাকে টান করে ক্ষতস্থানে রুমাল চেপে ধরল। দুজনেই এমন ভাবে নিশ্বাস নিচ্ছিল যেন তারা অনেকক্ষণ ছুটেছে। অবশেষে রুমালটা ছিঁড়ে ফেলে জয় হাতে পটি বাঁধল। কোলবেয়র ঘড়ির দিকে তাকাল।

"মনে হচ্ছে পাঁচ মিনিট কেটে গেছে। এখন আমি নিশ্চিন্ত।"

জয় উত্তর দিল না, সে কোলবেয়রের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। যখন সে ফিরে তাকাল তখন কোলবেয়রকে আর বনের ভেতরের সেই ফাঁকা জায়গাটায় দেখা গেল না।

জয় অবাক হয়ে ডাকল: "কোলবেয়র!" জয় কিন্তু কোন ক্রমেই কোলবেয়রকে ক্ষমা

করতে পারল না; কোলবেয়র তার যে ক্ষমতাকে পুরোপুরি পর্যুদস্ত করে দিয়েছে ভেতরে
ভেতরে তখনও সেই প্রবল বিরোধিতার চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে ধামসানো ঘাসের চিহ্ন অনুসরণ করে জয় এগিয়ে চলল, তার পর ঝোপের ভেতরে উঁকি মারতে থমকে দাঁড়াল।

কোলবেয়র চিত হয়ে পড়ে ছিল, তার মুখ কালো হয়ে গেছে, ফুলে গেছে। সে যেন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। তার দু চোখের পাতা ভারী হয়ে এসেছে, প্রাণ-বাঁচানো রক্তে মাখামাখি গোঁফ আর মুখ থেকে প্রকাশ পাচ্ছিল সমস্ত আতঙ্ক, যা থেকে সে মুক্ত করেছে তার ভালোবাসার পাত্রীকে। এই বীভৎস, বিষাক্ত মুখটি শেষ পর্যন্ত জয়কে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলল, কেন না যে পরিণতির হাত থেকে সে উদ্ধার পেয়েছে তা যে কতদূর ভয়াবহ সেটা যেন প্রত্যক্ষ করতে পেরে জয় চিৎকার করতে করতে ছুটল: "বাঁচাও, মারা গেলাম!"

কিন্তু আর সময় ছিল না, যেহেতু সে বেঁচে গেছে।

১৯২৬



বাবার ক্রোধ

দীর্ঘকাল সফরের পর বেরিং বাড়ি ফিরে আসার আগে আগে তার ছেলে, ছোট্ট টম বেরিং কর্ণেলিয়া-পিসি আর তার স্বামী কার্ল-পিসেমশাইয়ের কাছে নাস্তানাবুদ হল।

টম অন্ধকার লাইব্রেরী-ঘরে সাবানের ফেনার রঙিন বুদ্‌বুদ ছাড়ছিল। এর চেয়েও বড় বড় অপরাধ অবশ্য সে করেছে: যেমন, আতসকাচ দিয়ে হলুদ পর্দা ফুটো করে দেওয়া, 'দেকামেরন' বই খুলে তার ছবি দেখা, পড়শীর ছেলের সঙ্গে মারামারি — তবে কর্ণেলিয়াকে বিশেষ করে উত্তেজিত করে তোলে সাবানের বুদ্‌বুদ। বিশাল, কেতাদুরস্ত বাড়িতে এরকম চাপল্য অসহ্য, তাই কার্ল-পিসেমশাই গম্ভীর ভাবে বালকের কাছ থেকে সাবানের ফেনাসুদ্ধ পাত্রটা কেড়ে নিলেন, আর কর্ণেলিয়া-পিসি — কাচের নলটা।

কর্ণেলিয়া অনেকক্ষণ ধরে টমকে নষ্ট ছেলেদের নিদারুণ ভাগ্য সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে বললেন যে তারা অপরাধী কিংবা ভবঘুরে হয়, তারপর ভর্ৎসনা শেষ করে বললেন:

"তোর বাবার ক্রোধ দেখলে মজাটা টের পাবি। ভাই ফিরে এলেই আমি কোন রকম দয়ামায়া না দেখিয়ে তোর কীর্তিকান্ডের কথা বলে দেব। তখন দেখিস তার ক্রোধ।"

কার্ল-পিসেমশাই ঝুঁকে পড়ে কোমরে হাত ঠেকিয়ে যোগ করলেন:

"সে ক্রোধ বড় সাঙ্ঘাতিক!"

ওরা চলে গেলে টম বড় আরাম-কেদারাটায় ডুব দিয়ে মনে মনে ভাবার চেষ্টা করল তার কপালে কী আছে। কর্ণেলিয়া ও কার্ল অবশ্য বরাবরই বাড়িয়ে কথা বলেন, কিন্তু বারবার বাবার 'ক্রোধের' কথা মনে করিয়ে দেওয়ার ফলে টম রীতিমতো মুহ্যমান হয়ে পড়ল। ক্রোধ জিনিসটা যে কী তা পিসিমা কিংবা পিসেমশাইকে জিজ্ঞেস করার অর্থ হত সে যে ভয় পাচ্ছে সেটা প্রকাশ হয়ে যাওয়া। টমের ইচ্ছে ছিল না তাদের এই তৃপ্তি দেওয়ার।

একটু ভেবে টম আরাম-কেদারা থেকে নেমে গম্ভীর চালে বাগানের দিকে চলল, তার আশা ছিল সেখানে কাউকে দেখতে পেলে তার কাছ থেকে কিছু জানা যাবে।

ওক গাছের ছায়ায় শুয়ে শুয়ে পত্রিকা পড়ছিলেন কর্ণেলিয়ার জনৈক আত্মীয় সাহিত্যিক অস্কার মঙ্ক্।

টম রেড ইন্ডিয়ানের ভঙ্গিতে পা টিপে টিপে নিঃশব্দে তার কাছাকাছি এসে চেঁচাল:

"হুপ্!"

মঙ্ক্ পত্রিকা সরিয়ে রেখে বালকের হাঁটু জড়িয়ে ধরে নিজের দিকে টানলেন।

"ওরিনোকোতে আর কোন ঝামেলা নেই," তিনি বললেন। "হুরোনরা প্রেইরীতে বেরিয়ে এসেছে।"

কিন্তু টম বিষণ্ণ, সে খেলায় প্রলুব্ধ হল না।

"আচ্ছা, ক্রোধ কাকে বলে আপনি জানেন কি?" মুখ কালো করে সে জিজ্ঞেস করল। "কাউকে বলবেন না কিন্তু, যে আপনার সঙ্গে ক্রোধ নিয়ে আমার কথা হয়েছে।"

"ক্রোধ?"

"হ্যাঁ, বাবার ক্রোধ। বাবা কাল আসছে। তার সঙ্গে আসছে ক্রোধ। পিসি আমার নামে চুকলি কেটে বলবে যে আমি বুদ্‌বুদ ছেড়েছি, আতসকাচ দিয়ে জ্বালিয়ে পর্দা ফুটো করেছি। ফুটোটা কিন্তু ছোট্ট ছিল, কিন্তু... আমি চাই না যে ক্রোধ জেনে ফেলে।"

"ও এই কথা!" বলেই মঙ্ক্ এমন বিশ্রী সুরে হো হো করে হেসে উঠলেন যে টমের কাছে ব্যাপারটা দুর্বোধ্য ঠেকল, বালক তিন পা পিছিয়ে গেল। "হ্যাঁ তোমার বাবার ক্রোধ দেখতে সুবিধের নয়। এরকম দানব কমই আছে। তার চার হাত, চার পা। দারুণ ছোটে! চোখ টেরা। লোকটা বিশ্রী। কদর্য জীব!"

মঙ্ক্ এমন সোল্লাসে ভয়ঙ্কর জীবটির বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছেন দেখে ভেবাচেকা খেয়ে তাকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে টমের মন খারাপ হয়ে গেল, সে পিছু হটল। আরও কাউকে যে জিজ্ঞেস করবে সে প্রবৃত্তি আর তার রইল না, কিছুক্ষণ সে চিন্তিত ভাবে বাগানের বীথীর পথে ঘোরাঘুরি করল, শেষকালে দেখতে পেল পাশের বাড়ির মেয়ে আট বছর বয়সী মলিকে; টম নিজের দুর্ভাগ্যের কথা জানানোর উদ্দেশ্যে মলির দিকে ছুটে গেল, কিন্তু মলি টমকে দেখে দৌড়ে পালিয়ে গেল, কেন না দুজনে মিলে হট হাউসের কাচের গায়ে তীর ছোঁড়ার পর বাড়ি থেকে ওকে টমের সঙ্গে খেলতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে সচরাচর যেমন হয়, টমই উদ্যোগী বলে গণ্য হল, যদিও এবারে মলি নিজেই তাকে কাঠামোটা 'পরখ করে দেখার' জন্য উস্কানি দিয়েছিল।

এই কোঁকড়া চুলওয়ালা পাতলা গড়নের প্রাণীটির প্রতি অনুরাগ ও সম্ভ্রমের বশবর্তী হয়ে টম সোজাসুজি ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে ছুটল, তার মুখ ছড়ে গেল, কিন্তু বালিকার নাগাল সে ধরতে পারল না; অপমানে তার চোখে জল এলো। চোখের জল মুছে সে বাড়ির দিকে চলল।

খাস চাকরানী সকালের খাবারের জন্য টেবিল সাজিয়ে চলে গেল। টম লক্ষ করল বড় ডিকেণ্টারে সোনালি রঙের মদ, তার মনে পড়ল যে ক্যাপ্টেন কিড ('উপকূলের দস্যু' বইয়ের নায়ক) এক জনবসতিশূন্য দ্বীপে সম্পূর্ণ এবং জঘন্য নিঃসঙ্গতার মধ্যে রাম পান করতে বাধ্য হয়েছিল। টমের খুবই ভালো লাগত কিডকে, তাই টেবিলে উঠে সে এক গেলাস মদ ঢেলে নিল, বিড়বিড় করে বলল:

"আপনার স্বাস্থ্য কামনা করে ক্যাপ্টেন। আমি জাহাজে এসেছি আপনাকে বাঁচানোর জন্য। ঘাবড়াবেন না, আপনার মেয়েকে আমরা খুঁজে বার করব।"

টম গেলাসে সবে চুমুক দিয়েছে, অমনি কর্ণেলিয়া ঘরে ঢুকে মাতালটাকে টেবিল থেকে তুলে বিনা বাক্যব্যয়ে, তবে নির্দয় না হয়ে তার পাছায় তিনটে চাপড় মারলেন। তারপর শোনা গেল ক্ষিপ্ত বৃদ্ধার চিৎকার, তার হাত ঝটকা মেরে ছাড়িয়ে নিয়ে অপরাধী বাগানে পলায়ন করল, সেখানে কাঠের তৈরি কুঞ্জভবনের পাটাতনের নীচে গিয়ে লুকিয়ে রইল।

তার বোধ হচ্ছিল যে বাঁচার আর কোন আশা নেই। তার একমাত্র আশা-ভরসা — ক্রোধের সামনে বাবার সালিসি।

বাবার সম্পর্কে টমের যতটুকু মনে আছে তা হল এই যে তার গোঁফজোড়া কালো, তার ঈষদুষ্ণ বড় হাতের ভেতরে টমের মুখ পুরো ঢাকা পড়ে যায়। মার কথা তার মনে নেই।

সে বসে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করল ক্রোধকে যখন খাঁচা থেকে ছাড়া হবে তখন কী ঘটবে। টমের মতে, দানবের জন্য খাঁচার অবশ্যই দরকার। সে কোণ থেকে ধনুক আর দুটো তীর বার করল। এগুলো সে নিজেই বানিয়েছিল, কিন্তু এ ধরনের অস্ত্রের যোগ্যতা সম্পর্কে তার সন্দেহ হল। অনুপ্রাণিত হয়ে টম কুঞ্জভবনের নীচ থেকে বেরিয়ে এলো, চুপি চুপি বারান্দা দিয়ে গিয়ে ঢুকল কার্ল-পিসেমশাইয়ের কাজের ঘরে। সেখানে দেয়ালে ঝুলছিল পিস্তল আর বন্দুক।

টম জানত যে ওগুলিতে গুলি ভরা নেই, কেন না এ কথা সে অসংখ্যবার শুনেছে। তবে তার আশা ছিল মালির ছেলের কাছ থেকে খানিকটা বারুদ চুরি করে আনতে পারবে। গুলির কাজ হতে পারে ঢিল দিয়ে। টম ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে সোফার পিঠের ওপর উঠে সবে পাড়তে শুরু করেছে তামার নলওয়ালা বিশাল একটা পিস্তল, অমনি কার্ল-পিসেমশাই এসে হাজির। অবাক হয়ে গিয়ে তিনি শিস্ দিয়ে উঠলেন, তারপর শক্ত আঙ্গুলের মুঠোয় বালকের মাথার পেছনটা আঁকড়ে ধরলেন। টম ঝটকা মেরে ছাড়িয়ে নিতে সোফা থেকে পড়ে গেল, হাঁটুতে আঘাত পেল।

সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে উঠে দাঁড়াল, মাথা হেঁট করে গোমড়ামুখে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল পিসেমশাইয়ের বিশাল বুটজোড়ার দিকে।

পিসেমশাই শুরু করলেন, "বল্ দেখি টম, যেখানে কখনও কোন কেলেঙ্কারি ঘটে নি, তুই, হ্যারলড বেরিং-এর ছেলে হয়ে যে চুরির উদ্দেশ্যে গোপনে সেই কামরায় ঢুকলি, এটা কি তোর যোগ্য কাজ হল? নিজের আচরণের কথা তুই একবার ভেবে দেখেছিস কি?'

"আমি ভেবেছি," টম বলল। "পিসেমশাই, আমার পিস্তল দরকার ছিল। বিনা যুদ্ধে আমি হার মানতে রাজী নই। বাবার সঙ্গে আপনাদের যে ক্রোধ আসবে সে আমাকে ধরতে পারবে না। কেবল আমি মরলে — তার আগে নয়। প্রাণ থাকতে আমি তার কাছে ধরা দেব না।"

কার্ল-পিসেমশাই চুপ করে রইলেন, তার মুখ থেকে একটা চাপা গরগর আওয়াজ বেরিয়ে এলো। তিনি জানলা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পাইপে তামাক ঠাসতে লাগলেন। এই কাজ শেষ করার পর তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন, তার মুখ কেন যেন মঙ্কের মুখভঙ্গিকে মনে করিয়ে দিল।

"আমি তোকে এখানে তালাচাবি দিয়ে আটকে রেখে দেব, সকালের খাওয়া বন্ধ," কার্ল-পিসেমশাই কামরার দোরগোড়ায় শান্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন। "এখানে থাকবি, এখন শুনতে পাবি আমি যখন দরজা বন্ধ করি তখন চাবি ঘোরানোর কী রকম কটকট আওয়াজ হয়। ঐ রকমই দাঁত কড়মড় করে ক্রোধ। খবরদার, কিছু ছুঁবি না বলছি।"

এই বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন, দুবার কটকট করে চাবি ঘোরালেন, চাবিটা ফুটো থেকে বার করে পকেটে রাখলেন।

টমও তৎক্ষণাৎ চাবির ফুটোয় চোখ রাখল। পিসেমশাই মোড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন দেখে টম জানলা খুলল, পাশের একটা চালাঘরের ছাদে উঠে পড়ে সেখান থেকে লাফ দিয়ে পড়ল ফুলের কেয়ারির ওপর, কিছু ফুলের ঝোপ তাতে ধামসে গেল। এক চরম দুর্দশাগ্রস্ত প্রাণীর অসাড় নৈরাশ্য তাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল। তার ইচ্ছে হল

 বনে যায়, যতক্ষণ না সোনা আর অস্ত্রের গোপন ভাণ্ডার খুঁজে বার করতে পারে, ততক্ষণ সুরঙ্গ ঘর খুঁড়ে ফুলফল খেয়ে তার ভেতরে বাস করে।

মনে মনে এই রকম চিন্তা করতে করতে টম পা বাড়িয়ে দিল বেড়ার দিকে, এমন সময় রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল বড় রাস্তা ধরে কার্ল-পিসেমশাইয়ের বাড়ির দিকে ছুটে আসছে মোটরগাড়ি। গাড়িতে কালো গোঁফওয়ালা এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের পাশে বসে ছিল এক তরুণী — তার চুলের রঙ হালকা সোনালি। এই মোটরগাড়িটার পেছন পেছন আসছিল দ্বিতীয় আরেকটি মোটরগাড়ি — বাক্স পেঁটরায় বোঝাই হয়ে।

টম এই সব নিরীক্ষণ করতে না করতে গাড়িদুটো বাড়ির প্রবেশপথের দিকে মোড় নিল, গাড়ি চলার আওয়াজও থেমে গেল।

যে বিশাল হাতের ভেতরে বালকের পুরো মুখটা ঢাকা পড়ে যেত তার সম্পর্কে অস্পষ্ট স্মৃতি মনে জাগতে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হল, তারপর তীরবেগে ছুটল বাড়ির দিকে। 'এই কি আমার বাবা?' কামরা থেকে পলায়নের কথা বিস্মৃত হয়ে সান্ত্বনা ও ক্ষমা লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা বশে সে সরাসরি ফুলের কেয়ারির ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে মনে মনে ভাবল।

খিড়কি-দরজা দিয়ে ঢুকে সবগুলি ঘর একে একে পেরিয়ে টম সদর দেউড়িতে এসে পেঁছাল। আর তখন তার সন্দেহও ঘুচে গেল। কর্ণেলিয়া, কার্ল, মঙ্ক্, বাড়ির খাস চাকরানী, চাকর — সবাই এখানে, সবাই ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে কালো গোঁফজোড়ার অধিকারী দীর্ঘকায় পুরুষ আর তার সঙ্গিনীর চারধারে।

"হ্যাঁ, আমি একদিন আগেই চলে এসেছি," বেরিং বললেন, "ছেলেটাকে দেখার জন্য মন ছটফট করছিল। ও কোথায়? দেখছি না যে?"

"আমি ওকে নিয়ে আসছি," কার্ল বললেন।

"আমি নিজেই এসেছি," কর্ণেলিয়া আর স্থূলাঙ্গিনী চাকরানীর মাঝখানে শরীর গলিয়ে দিয়ে ঢুকে পড়ে টম বলল।

বেরিং চোখ কোঁচকালেন, সামান্য নিশ্বাস ফেললেন, ছেলেকে তুলে নিয়ে তার আঁচড় লাগা গালে চুমো খেলেন।

কার্ল-পিসেমশাই চোখ বড় বড় করে তাকালেন।

"তোকে না শাস্তি দেওয়া হয়েছিল! তোকে যে আটকে রাখা হয়েছিল!"

"আজ ও অ্যামনেস্টিতে ছাড়া পেল," ছেলেকে তরুণীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বেরিং জানালেন।

'এই কি বাবার ক্রোধ নাকি?' টম ভাবল। 'মনে ত হয় না। দেখতে সে রকম নয়।'

"ও হবে তোমার মা," বেরিং বলল। "কেট এই বোকা ছেলেটার মা হতে হবে তোমাকে।"

"আমি তোমার সঙ্গে খেলব," সুড়সুড়ি দেওয়া একটা ঈষদুষ্ণ কণ্ঠস্বর টমের কানে কানে ফিসফিস করে বলল।

টম তার হাত আঁকড়ে ধরল আর বাবার কথায় বিশ্বাস করে তরুণীর বড় বড় নীল চোখের দিকে তাকাল। কোনটাই কার্ল ও কর্ণেলিয়ার মতো একেবারেই মনে হল না। উপরন্তু সকালের খাবার সম্পর্কে সে এখন নিশ্চিন্ত।

তাকে নিয়ে খানিকটা মাতামাতি চলার পর নিয়ে যাওয়া হল হাত মুখ ধোয়াতে। এদিকে টমের মনে কিন্তু মোটেই শান্তি নেই, কেননা কার্ল এবং কর্ণেলিয়া — দুজনকেই সে ভালোমতো জানত। ওঁরা সব সময় ওঁদের কথা রাখেন, আর এখন নির্ঘাত ক্রোধের সঙ্গে জোট পাকাচ্ছেন। চাকরানী তোয়ালে বদলানোর জন্য চলে যেতে সুযোগ বুঝে টম ছুটল সেই ঘরটার দিকে যেটা বাবার জন্য সাজানো হয়েছিল বলে তার জানা ছিল। ৯৩

টম জানত যে ক্রোধ সেখানেই থাকবে। ও আটক হয়ে আছে, চুপচাপ ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করছে কখন ওকে ছাড়া হবে।

চাবির ফুটোয় চোখ লাগিয়ে টম কাউকেই দেখতে পেল না। মেঝেতে পড়ে আছে আঁটি বাঁধা গ্যালিচা, পশুর গায়ের লোমশ চামড়া, সতরঞ্চিতে জড়ানো বাক্স। কয়েকটি সিন্দুক — সেগুলির মধ্যে দুটির ডালা খোলা, দেয়ালের গায়ে লেগে আছে। শান্ত ও অনড় জীবনের আচারনিষ্ঠার গুরুভারে সুসজ্জিত এই বিশাল ঘরের অভ্যন্ত দৃশ্য এর ফলে বদলে গেছে।

যে কাজ সে করতে চলেছে তার জন্য মনে মনে ভয় পেলেও হৃদয়ে যে ভার চেপে বসেছে সেটাকে দূর করার অদম্য বাসনা হেতু টম দরজা ধরে টান দিল, ঘরে প্রবেশ করল। সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল এই দেখে যে খাটের ওপর পড়ে আছে সত্যিকারের একটা রিভলভার। বই পড়ে কেবল জানত গুলি ছোঁড়ার জন্য কোথায় টিপতে হয়। এ ছাড়া রিভলভারের ব্যাপারে আর কিছুই যদিও টম বুঝত না তবু সে ব্রাউনিংটা খপ করে তুলে নিল এবং সেটাকে হাতে বাগিয়ে ধরে সাহসে ভর করে খোলা সিন্দুকের দিকে এগোল।

তখন সে ক্রোধের দেখা পেল।

দু বিঘত পরিমাণ উঁচু, চারটি হাতওয়ালা এক সাদা দানব সিন্দুকের ভেতর থেকে ভয়ঙ্কর, ট্যারা চোখ মেলে তার দিকে কটমট করে তাকাল।

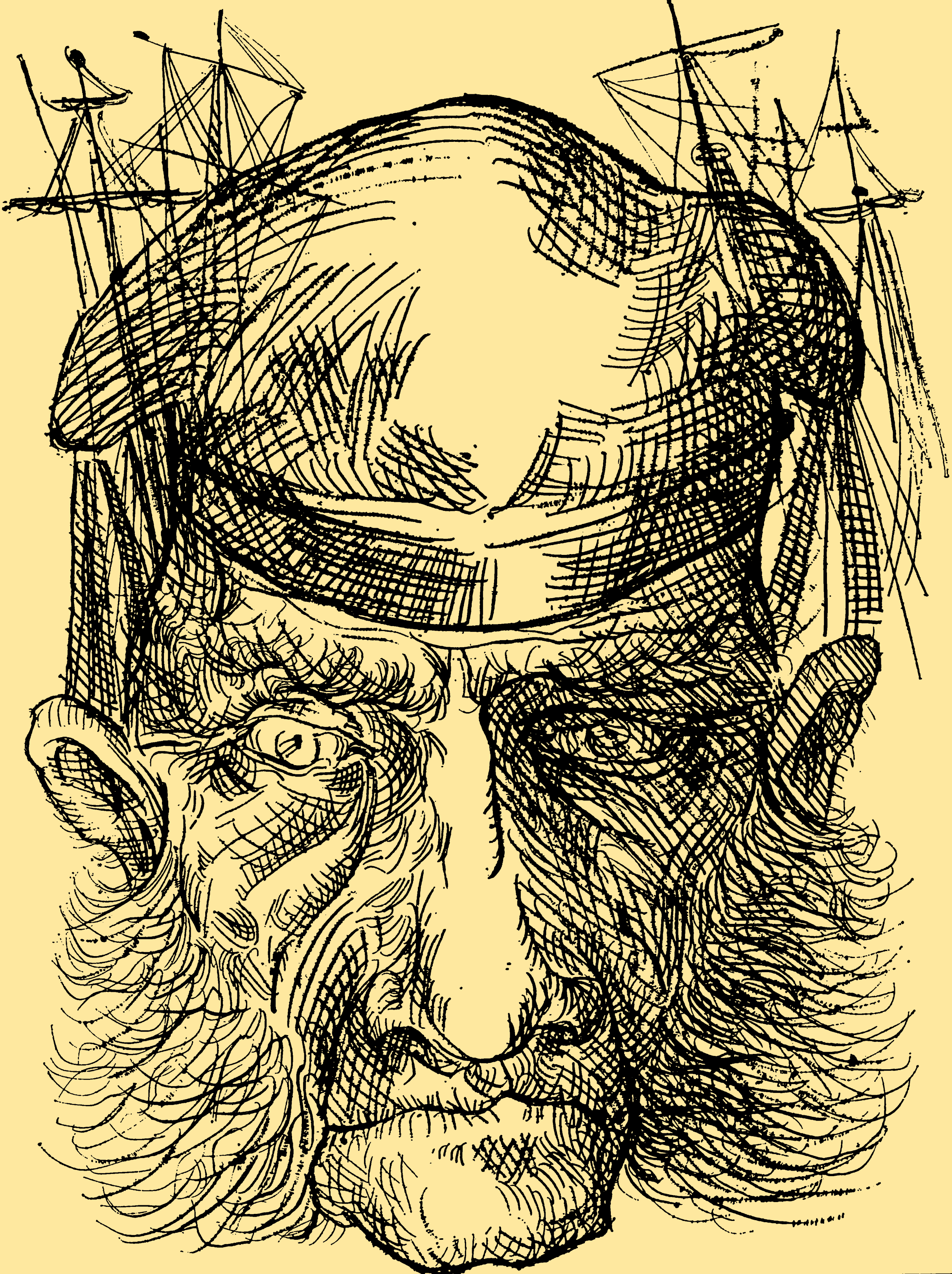
টম চেঁচিয়ে উঠল, যেখানটায় টেপা দরকার সেইখানে টিপ দিল।

সিন্দুকে যেন বিস্ফোরণ ঘটল। সেখানে থেকে যতরাজ্যের খোলামকুচি ছিটকে বেরিয়ে এসে ঝনঝন করে জানলায় ও টেবিলে পড়তে লাগল। টম মেঝেতে বসে পড়ল, রিভলভার চেপে ধরে তখনও সে গোলাবর্ষণ করে চলেছে। কাগজের মতো ফেকাসে হয়ে গিয়ে কার্ল ও কর্ণেলিয়ার সঙ্গে বেরিং ছুটে এলে অবশেষে ওটাকে একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল বেরিং-এর কোলে।

"তোমার ক্রোধকে আমি মেরে ফেলেছি!" সে সোল্লাসে ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে চেঁচাল। "আমি ওকে গুলি করে মেরেছি। ও আর কখনও আমার গায়ে হাত দিতে পারবে না! আমি কিছুই করি নি! আমি আগুনের ছেঁকা দিয়ে ফুটো করেছি, আমি কিডের সঙ্গে রাম খেয়েছি, কিন্তু ক্রোধকে আমি চাই নি!"

"স্থির হ টম," ছেলের দেহটা থরথর করে কাঁপছে দেখে তাকে চেপে ধরে স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বেরিং বললেন। "আমি জানি। জানি রে আমার সোনার ছেলে। টম, আহা, বেচারি, আমার বাছা রে!"

১৯২৮



বন্দরের কম্যান্‌ডান্‌ট

১

কম্যান্‌ডান্‌ট যখন মালবাহী জাহাজ 'রেকর্ডে'র' প্রখর আলোকিত সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে এসেছে। পোতাশ্রয়ে অতি জনপ্রিয়, বাহাত্তর বছর বয়সের এই ব্যক্তিটি ছিল ঋজু, সামান্য দুর্বল গড়নের এক বৃদ্ধ। শুকনো নাশপাতির মতো তার বলিরেখাঙ্কিত মুখটি ছিল নিখুঁত কামানো। মাছের পাখনার মতো দুপাশের জুলপিতে খাড়া খাড়া হয়ে থাকত সাদা চুল; পাকা ভুরুজোড়ার কানাতের নীচ থেকে মধুর হাসিতে ঝকঝক করত ছোট ছোট নীল দুটি চোখ। বিজলী বাতির উজ্জ্বল আলোয় কম্যান্‌ডান্‌টের জাহাজী টুপি, খয়েরী রঙের জ্যাকেট, সাদা প্যাণ্ট, নীল রঙের টাই আর সস্তা দামের ছড়ি — সেগুলির যে দৈন্যদশার সাক্ষ্য দিচ্ছিল, মেরামতের শত চেষ্টায়ও তা যাবার নয়। কম্যান্‌ডান্‌টের হলুদ রঙের জুতোজোড়া বাইশ বার ফেটেছে, আর ঠিক ততবারই হয় সুতো দিয়ে তাদের সেলাই করা হয়েছে, নয়ত তারের টুকরো দিয়ে করা হয়েছে মজবুত। জ্যাকেটের বুকপকেট থেকে উঁকি মারছে শক্ত সেলাই করে আঁটা রঙিন রেশমী কাপড়ের একটা টুকরো।

জামার কলার সযত্নে স্পর্শ করে, অতঃপর গেলিসের কোন একটা অবাধ্য ফিতেকে বাগে আনার চেষ্টায় কাঁধদুটো ইতস্তত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বৃদ্ধ প্রহরারত অফিসারের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল, মাথাটা এক পাশে হেলিয়ে ঝট করে দুহাত বাড়িয়ে দিল।

"টম ল্যাস্টন!" কম্যান্‌ডান্‌ট সোল্লাসে, কাঁপা কাঁপা গলায় বলল। "আমি জানতাম যে এই চমৎকার জাহাজে আবার দেখতে পাব আপনাকে, আপনার আদরের সেই বেট্‌সীর স্বপ্ন নিয়ে মশগুল থাকতে, যিনি আছেন ওখানে... অনেক দূরে। বজ্র আর বিদ্যুৎ! আশা করি সমুদ্রযাত্রা ভালোই চলছে?"

"কুট্‌গে!" ল্যাস্টন দূরের কাউকে উদ্দেশ্য করে হাঁক দিল। "কম্যান্‌ডান্‌ট এসেছে রে! এখন কী করা যায়?"

"ঘাড়ে রদ্দা দিয়ে ভাগিয়ে দে!" কড়া জবাব ভেসে এলো।

বৃদ্ধের দৃষ্টিতে মিনতি, হতবুদ্ধি ও চাঞ্চল্যের ভাব প্রকাশ পেল। তার হাতের ছড়িটা একটু উঠে আবার নেমে গেল, প্রভুর মেজাজ বোঝার চেষ্টা করার মুহূর্তে কুকুরের লেজের যেমন অবস্থা হয়।

"বোঝ কাণ্ড, সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়ে রদ্দা!" ল্যাস্টন অমায়িক ভঙ্গিতে বৃদ্ধের কাঁধে চাপড় মেরে সাড়া দিয়ে বলল, ফলে কম্যান্‌ডান্‌ট ভাঁজ হয়ে দুমড়ে বসে গেল। "কুট্‌গে, আমার মনে হয় তুই কম্যান্‌ডান্‌টকে সালাম জানাতে চাস, তাই না? ভয় পেও না কম্যান্‌ডান্‌ট, কুট্‌গে ঠাট্টা করছে।"

"ঠাট্টার আবার কী আছে?" মোটা হাড় আর চওড়া কাঁধের অধিকারী প্রধান স্টোকার কুট্‌গে এগিয়ে আসতে অসতে বলল। "যখনই গেরটনে আসি না কেন, কম্যান্‌ডান্‌ট নির্ঘাত আসবে। একেবারে জ্বালিয়ে খেল। আরে বুড়ো, ঘুমোতে গেলেই ত পার।"

"আমি সবে 'আব্রাহাম রেপ্' থেকে ঘুরে এলাম," স্টোকারের অপ্রীতিকর কথা না শোনার চেষ্টা করে কম্যান্‌ডান্‌ট আমতা আমতা করে বলল। "ওখানে সব ঠিকঠাক আছে। যাত্রা ভালো হয়েছে, ভোর বেলায় 'রেপ্' চলে যাচ্ছে। কফি খেলাম, সারেঙ্গ টল্‌বির সঙ্গে চেকার খেললাম। চমৎকার লোক! কেমন আছেন কুট্‌গে? আশা করি সব ভালো? আপনার শ্রদ্ধেয় পরিবার পরিজনবর্গ?"

"সিগারেট খাও," বৃদ্ধের হাতে একটা কালো সিগারেট গুঁজে দিয়ে কুট্‌গে বলল। "শক্ত করে হাত দিয়ে ধর — নইলে পড়ে যাবে।"

"আরে এই ত, ক্যাপ্টেন সাব যে।" চঞ্চল হয়ে উঠে গায়ের জ্যাকেটটা টেনে ঠিকঠাক করতে করতে এবং ব্যস্তসমস্ত ভাবে ছুটে ক্যাপ্টেনের কাছে আসতে আসতে কম্যান্‌ডান্‌ট চেঁচাল। ক্যাপ্টেন তখন সস্ত্রীক শহরের থিয়েটারে যাচ্ছিলেন। "সালাম ক্যাপ্টেন সাব! সালাম, অসীম শ্রদ্ধাভাজন আর... হুম্... সন্ধ্যাটা এত সুন্দর যে মন চায় এসপ্লানেডে একটু ঘোরাঘুরি করতে, অপূর্ব গানবাজনা শুনতে। কেমন আছেন? আশা করি সব ভালো। ঝড়ের কবলে পড়তে হয় নি ত? আপনার স্বাস্থ্য... ভালো ত?"

"ও... আপনি, টিল্‌স!" ক্যাপ্টেন হেনরি হাল্‌টন দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন। দীর্ঘকায় ক্যাপ্টেনের বয়স বছর পঁয়ত্রিশ, তাঁর বিশাল মুখটি রোদে-বাতাসে কড়া-পড়া। "এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন — খুবই ভালো! আপনাকে দেখে খুশি হলাম! আমাদের অবশ্য তাড়া আছে, তাই এই ডলারটা ধরুন, রান্নাঘরে বাট্‌লারের কাছে চলে যান, ওখানে তার সঙ্গে কথাবার্তা বলুন। আপনার মঙ্গল কামনা করি। মেরী, ইনিই কম্যান্‌ডান্‌ট।"

"আচ্ছা, আপনিই সেই?" অল্পবয়সী মহিলাটি হেসে বললেন, "পোর্ট কম্যান্‌ডান্‌ট? আপনার কথা আমি শুনেছি।"

"আমাকে সব্বাই জানে!" টিল্‌স এক হাতে সিগারেট আর অন্য হাতে ডলার ও ছড়ি ধরে রেখে বৃদ্ধসুলভ খনখনে গলায় হেসে বলল। "জাহাজীরা দারুণ লোক, আর আমাদের ভালো লাগা, আশা করি দুই তরফা। আমি, আপনাকে কী বলব, জাহাজীদের রীতিমতো ভক্ত। জাহাজের ডেক আমাকে টানে... যেন... যেন... যেন..."

ক্যাপ্টেন কথাটা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে তীরে নেমে গেলেন, আর টিল্‌স পেছন থেকে ওদের উদ্দেশে বিনীত ভাবে মাথার টুপি সামান্য উঠিয়ে ল্যাস্টনকে লক্ষ করে শেষ করল তার বক্তব্য:

"খাসা আপনাদের ক্যাপ্টেন লোকটি। সত্যিকারের দুর্ধর্ষ ছোকরা। আপাদমস্তক।"

এখানে ব্যাখ্যা করে বলা প্রয়োজন যে কুখ্যাত সরাইখানা থেকে শুরু করে শুল্ক দপ্তর অবধি — বলতে গেলে পোতাশ্রয়ের সর্বত্র কম্যান্‌ডান্‌ট (এটা ছিল তার ডাক নাম) পরিচিত ছিল। টিল্‌স সারা জীবন এক বড় প্রাইভেট কোম্পানির স্টোরে কেরানির কাজ করে, শেষে পরিণত বয়সের কারণবশত সেখান থেকে বরখাস্ত হয়। এর পর থেকে টিল্‌সের ভরণপোষণ করত তার বিধবা বোন, পঞ্চাশ বছর বয়স্কা নিঃসন্তান মহিলা রেবেকা বার্টেল্‌স। সে এই বোনের বাড়িতেই থাকত।

টিল্‌সের নাবিক হওয়ার পথে বাধা ছিল তার মৃগী রোগ। বৃদ্ধবয়সে এর প্রকোপ অন্তর্ধান করলেও সে নাবিক থেকে যায় কেবল কল্পনায়। সকালবেলায় বোন তার

জ্যাকেটের পকেটে পুরে দিত একটা বড়সর স্যান্ডউইচ, পুরুষমানুষের এটা-সেটা
খরচের জন্য দশ সেণ্ট দিত; কম্যানডান্টও ছড়ি ঘুরোতে ঘুরোতে শুরু করত বন্দরে টহল দিতে। স্বার্থান্বেষী কোন লক্ষ্য তার থাকত না, তাকে ছোটবেলা থেকে আকর্ষণ করত নাবিক আর জাহাজ, যখন সে মায়ের কোলে ছিল তখনই নীল সমুদ্রের গা বয়ে জাহাজের পাল নেমে আসতে দেখে সে তার কচি কচি দুই হাত সেই দিকে বাড়িয়ে দেয়।

শুকনো, কাঁপা-কাঁপা হাতে সিগারেট ধরিয়ে কম্যানডান্ট সাবলীল, ছোট ছোট পদক্ষেপে রওনা দিল রান্নাঘরের দিকে। সেখানে তার ভুরু আর জুলপি নজরে আসতে বাবুর্চি হো-হো করে হেসে উঠল।

"আমি জানতাম যে তোমার আগমন ঘটবে, টিল্‌স!" একটা টুল তার দিকে এগিয়ে দিয়ে, পট থেকে একটা মগে কফি ঢালতে ঢালতে অবশেষে সে বলল। "কোথায় ছিলে? 'স্টেলা' সম্ভবত তোমার নজরে পড়ে নি, ওটা আছে তেলের জেটির ওপাশে, ফ্যাক্টরির উল্টো দিকে। এখুনই ওখানে তাস খেলা আর মদ খাওয়া চলছে।"

"অত তাড়ার কিছু নেই, তাড়ার কিছু নেই, শ্রদ্ধেয় পিটার বাট্‌লার," দীর্ঘশ্বাস ফেলে, টুলটাকে টেবিলের কাছে এগিয়ে নিয়ে বসে পড়ে বলল টিল্‌স। দু হাত জড় করে রাখল ছড়ির বাঁকানো মাথার ওপর। "আপনার মহামান্য স্বাস্থ্যের হালচাল কেমন? যাত্রা ভালো হয়েছে ত? আপনার অশেষ শ্রদ্ধাভাজন পত্নী আশা করি শান্তভাবে আপনার প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা করছেন? হুম্... 'স্টেলা' থেকে ঘুরে এসেছি। আমি যখন ছিলাম তখনও খেলা আরম্ভ হয় নি, ওরা সবে তাস কেনার জন্য সুপারকার্গোকে পাঠিয়েছে। হ্যাঁ, ঠিকই বলছি! তবে, জানেন কিনা, আমি শিগগিরই চলে আসি, কেন না ওখানে দুটি লোক আছে, যারা আমাকে... ঐ আর কি... যাকে বলে, তেমন একটা ভালো চোখে দেখে না। ওরা বলল যে আমি নাছোড়বান্দা বুড়ো কাক আর... স্বভাবতই আমার মন খারাপ হয়ে গেল, তাই বলতে পারলাম না সব কিছুর প্রতি... দুঃসাহসী নাবিক... আর জাহাজের ডেকের প্রতি আমার ভালোবাসার কথা।... কিন্তু সব সময়ই আমার এমন হয়, আপনারা ত জানেনই..."

টিল্‌স বিষণ্ণ হয়ে একটু ফোঁপাল। বাট্‌লার লকারে হাত গলিয়ে ঠক করে টেবিলের ওপর এক বোতল আনারসের লিকার রাখল।

"তোমার মতো এরকম একজন পাকা জাহাজীর এক গেলাস খাওয়া উচিত," বাট্‌লার বলল। "ঠিক বলি নি? খেয়ে ঐ বদ লোকগুলোর কথা ভোলা যাক। তোমার স্বাস্থ্য কামনা করে! আমার স্বাস্থ্য কামনা করে! গপ্! গপাস্!"

আধ কাপ পরিমাণ পানীয় মাংসল মুখগহ্বরের ভেতরে উপুড় করে ঢেলে দিয়ে বাট্‌লার বুড়ো আঙুল দিয়ে নীচের ঠোঁট মুছে টিল্‌সের দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকাল। টিল্‌স তখন ধীরে ধীরে নিজের গেলাসে চুমুক দিচ্ছিল, সে তার দুই ঠোঁট নেড়ে এমন একটা ভঙ্গি করল যেন বলতে চাইল "হুম্।" টিল্‌সের চোখে জল এসে গিয়েছিল, সে নাক ঝাড়ল, নিভে যাওয়া সিগারেটটা চুষতে লাগল।

"আরও?"

"ধন্যবাদ। পরে দেখা যাবে। বজ্র বিদ্যুৎ! 'স্টেলা' ভালো জাহাজ, খুবই ভালো,"

 টিল্‌স বলল, আর প্রতিটি শব্দের সঙ্গে তার মাথা দুর্বল ভাবে নড়তে থাকে। "'স্টেলাকে' প্রথম জলে নামা হয় উনিশ শ' এক সালে। চার্লি এখন আর 'সাইরেনে' কাজ করে না, গতকাল মার্লির হোটেলে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়। বলল "বিশ্রাম করব।" চার্লি আরও বলল, "কথাটা হচ্ছে এই যে কোম্পানি আমার সঙ্গে হিসাব নিয়ে গোলমাল করেছে, বোনাসের টাকা পুরোপুরি মিটিয়ে দেয় নি।" আজ 'ব্ল্যাক বুল'-এ গিয়েছিলাম; গিয়েছিলাম অমনি হালচাল জানতে। সবই ঠিক ঠিক চলছে। রাম্পার তার শুঁড়িখানা সরিয়ে নিয়ে গেছে আরেক কোনায়, কেন না ঐ দালানটা এক দোকানের জন্যে বিক্রি হয়ে গেছে। ওয়াট্‌সন কিছুতেই তার পেন্‌শন যোগাড় করতে পারছে না, এমনই দুর্ভাগ্য। মদ যা খায়, সে আর কী বলব! খায় দারুণ, উটের মতো, সমুদ্রের সাপের মতোও বলতে পারেন। দেখতে বেশ লাগে। মগটা হাতে নিয়ে সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে। ওয়াট্‌সন বলে, "হ্যাঁ কান্ড হত বটে ফিলিপাইন্‌সে।" বলে, "জামাইকায় চমৎকার।" 'রয়েল স্টার' ডুবে গেছে। এখানে শোনা যাচ্ছে, সাইক্লোনের খপ্পরে পড়েছিল। আগুনের গোলা। সাইমন লেক্রিকে জানতেন কি? সেই যে জলদস্যুটা। সাইমন লেক্রি ছিল জলদস্যু, তা সে একবার আমাকে আপ্যায়ন করেছিল একটা... কাজের পর। সে কী বলে জানেন? বলে "'খাঁজকাটা' জাহাজ ডুবত না যদি খোদ শয়তান সাহায্য না করত।" তারপর সে এমন মুখ খারাপ করতে লাগল যে সকলেই ভাবনায় পড়ে গেল। সত্যি বলতে গেলে কি লেক্রি লোকটা ছিল চমৎকার! বজ্র বিদ্যুৎ! তখনই আমি ওকে বলেছিলাম: "লেক্রি, আপনাকে বলি কি, আমাকে নিন। শত্রু-জাহাজ শায়েস্তা করতে হলে আমাকে নিন। হিপ্‌ হিপ্‌ হুর্‌রে! জান কবুল!" কিন্তু সে কী নিয়ে যেন ব্যস্ত ছিল, আমার কথা শুনল না। তাহলে 'খাঁজকাটা' অক্ষত রয়ে যেত। সে আমি জানি। আমি থাকলে শয়তান অবধি..."

"সে ত বটেই, কম্যান্‌ডান্‌ট," রান্নাঘরের দরজার কাছে হাজির হয়ে ল্যাম্স্টন বলল, "তুমি ওদের ওখানে শৃঙ্খলা এনে দিতে।"

"স্বাভাবিক," টিল্‌স জোর দিয়ে বলল, "খুবই স্বাভাবিক। অবশ্যই।"

আরও এক গেলাস পান করার পর টিল্‌স উৎসাহিত হয়ে উঠল। শিগ্‌গির যাবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। সে যাবতীয় সাক্ষাৎকারের উল্লেখ করতে লাগল, এই দীর্ঘ জীবনে সে যা যা দেখেছে ও শুনেছে সেগুলির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলতে লাগল তার নিজস্ব ধ্যানধারণা। সে যে মাতাল হয়ে পড়েছিল তা নয়, কেবল একটু বেশি বকবক করে চলছিল, তার মনে হচ্ছিল সে যেন সুস্থসবল যুবক, দুনিয়ার শেষ প্রান্তে যাত্রা করতেও প্রস্তুত। কিন্তু ইতিমধ্যেই সে বাবুর্চিকে 'গ্রেনেল' জাহাজের প্রধান কারিগর মনে করে দুবার তাকে 'সেনিওর রিবেইরা' বলে ডেকেছে, আর ল্যাম্স্টনকে বলেছে 'হের বাউমান' — তাকেও গুলিয়ে ফেলেছিল দুই মাস্তুলওয়ালা জাহাজ 'বলিভিয়ার' সারেঙ্গের সঙ্গে; তখন বাবুর্চি দেখল এবারে কম্যান্‌ডান্‌টকে বিদায় করতে হয়। সেটা করা যেত মাত্র একটি উপায়ে, আর কম্যান্‌ডান্‌টও অবশ্যই তাতে হার মানত। বাবুর্চির উদ্দেশে চোখ টিপে ল্যাম্স্টন বলল:

"যাও দেখি কম্যান্‌ডান্‌ট, আমাদের লোকজনকে 'পিলিগ্রিমের' সঙ্গে নোঙ্গর বাঁধতে সাহায্য কর গিয়ে। এবারে আমরা নোঙ্গরের জায়গা বদল করব।"

টিল্‌স কুঁকড়ে গেল, আড়চোখে ধীরে ধীরে ল্যাস্টনের দিকে তাকাল, তারপর নার্ভাস হয়ে জামার কলারটা ঠিক করল।

"'পিলিগ্রিমকে' আমি জানি," টিল্‌স আমতা আমতা করে করুণ সুরে বলল। "খুবই ভালো জাহাজ। উনিশ শ' চৌদ্দ সালে ক্ষুধা অন্তরীপের কাছাকাছি জায়গায় রীফে লেগে তলায় দুটো ফুটো হয়ে যায়... স্পীড বারো নট... অবশ্যই!"

"যাও টিল্‌স, আমাদের লোকজনকে সাহায্য কর," নকল গাম্ভীর্য নিয়ে বাবুর্চি বলল।

কম্যান্‌ডান্‌ট ধীরে ধীরে টুপির কানাত টেনে শক্ত করে মাথায় টুপি ঠাসল এবং অতি কষ্টে টুল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার মাথায় এতক্ষণ যে একটা বুড়োটে বুড়োটে ঝিনঝিনে মৌতাতের ভার ছিল, বিশাল বিশাল মোটা মোটা কাছির দৃশ্যে কল্পনায় চোখের সামনে স্পষ্ট জেগে উঠতে তা টুটে গেল; তার উত্তাপ জুড়িয়ে গেল, সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

"আমি বরং বাড়ি যাই," বাট্‌লার ও ল্যাস্টন বুকের ওপর দুহাত জড় করে গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে আধবোজা চোখে তার সামনে বসে ছিল। তাদেরই উদ্দেশে জোর করে মুখে হাসি টেনে সে বলল। "হ্যাঁ আমাকে যেতেই হবে, কথা দিয়েছি আটটার পরে আর বাইরে থাকব না। নোঙ্গর করুন, আপনারা নোঙ্গর করুন, আপনাদের টব ভেড়ান গিয়ে 'পিলিগ্রিমের' গায়। হা-হা। মজাসে খেলা করুন! আমি চললাম..."

"দেখ কাণ্ড!" বাট্‌লার চেঁচিয়ে বলল। "সঙ্গে সঙ্গে চললে। ভগবানের দিব্যি, কম্যান্‌ডান্‌ট, এখুনি সারেঙ্গ আর অন্যেরা ফিরে আসবে, চলে এসো, আমাদের সাহায্য কর!"

"না, না, না! আমাকে যেতেই হবে, যেতেই হবে," টিল্‌স তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "কেননা, বুঝলেন কিনা, আমি আগে আগে আসব বলে কথা দিয়েছি।"

"এখান থেকে আপনি কোথায় চললেন?" প্রবেশ করতে করতে বলল অল্পবয়স্ক নাবিক শেঙ্ক।

"নমস্কার ইয়ং ম্যান! যাত্রা কেমন হল? কেমন আছেন আপনার অশেষ শ্রদ্ধেয়া..."

"...মাতৃদেবী, খুলিয়ে ফেলবেন না আবার — খুবই ভালো আছেন। হ্যাঁ, যে কথাটা বলছিলাম, যদি চান ত জাহাজী ক্লাবে যেতে পারেন। সেখানে বার-কাউন্টারে কাজ করে একটি মেয়ে — পেগি স্কটার।"

"পেগি স্কটার?" খানিকটা উৎসাহিত হয়ে টিল্‌স অস্পষ্ট ভাবে বলল, এমনকি 'রেকর্ডের' মোটা কাছিও এখন আর তার মনে ভীতির উদ্রেক করল না। "জানি না আবার? ওকে অবশ্যই জানি। চমৎকার মেয়ে, হলফ করে বলছি, এতে যদি কেউ আমার বুকে গুলি করে তাও সই। আমি বলছি, ওকে আমি জানি।"

"তাহলে তাকে গিয়ে বলুন যে তার বন্ধু, উইলি ব্ল্যাণ্ট এক মাস আগে এনোতে প্লেগে মারা গেছে। 'মোরগ ঝুঁটি' সবে এসে পৌঁছেছে, ওখানকার এক নাবিক ছিল 'ইউরেকাতে', যেখানে আমাদের লোকেরাও বসে আছে; ঐ নাবিকই জানাল। কে যাবে? যাবার মতো কেউ নেই। সবাই ভয় পাচ্ছে। কী ভাবে কথাটা বলা যায়? ও ত ডুকরে কেঁদে উঠবে। কিন্তু আপনি, টিল্‌স, ঠিক পারবেন; আপনি দৃঢ় চরিত্রের লোক, তা ছাড়া বালি-ঘড়ির মতো প্রাচীনও বটেন, আপনি এটা পারবেন। ঠিক বলি নি?"

 "ঠিকই বলেছ," সামনের দিকে পা ঠেলে, চূড়ান্ত রায় দিয়ে বলল ল্যাস্টন।

"ঠিক কথা," একটু চুপ থেকে সায় দিয়ে বলল বাট্‌লার।

"কেবল দেখবেন, সঙ্গে সঙ্গে বলা চাই। ওকে যন্ত্রণা দেবেন না। লেজ গুটিয়ে পিছিয়ে যাবেন না," শেঙ্ক শিখিয়ে দিল।

"হ্যাঁ, গড়িমসি করাটা খারাপ হবে," বাট্‌লার পোঁ ধরল। "কোপ সেরেই কেটে পড়।"

বুড়ো ঠোঁট কামড়াল, মাথা নীচু করল। শোনা যেতে লাগল নাবিকদের মাপা মাপা, ভারী নিশ্বাস — যেমন শোনা যায় কাজের সময়।

শেঙ্ক আবার বলতে শুরু করল, "ব্যাপারটা এই যে আপনার কাছ থেকে এটা গাছের ফিসফিসানির মতো ছাড়া আর কোন রকম শোনাবে না, কিংবা মনে হতে পারে যেন ঘড়ি টিক টিক করে বলছে: "ব্ল্যাণ্ট প্লে-গে মা-রা গেছে এনোয়।" এই ভাবে অনেক সহজ হবে। কিন্তু আমি যদি যাই, তা হলে বুঝলেন কিনা, ভালো দেখাবে না। সেক্ষেত্রে আমাকে যেতে হবে মদে চুর হয়ে।"

"হ্যাঁ, বলা চাই সঙ্গে সঙ্গে!" ভাঙা-ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে বলে টিল্‌স পা ঠুকল। "বুকে জোর নিয়ে, সাহস করে। ঐ হারামজাদীর হৃদয়টা পাথরে গড়া। খাঁটি জাহাজী পায়ের খুরের লাথি। কথা দিচ্ছি আপনাকে শেঙ্ক, বাট্‌লার, আপনাকে, আর আপনাকেও ল্যাস্টন। আমি এক্ষুনি কাজটা করব।"

২

ক্লাবের নীচের তলার হল্‌-ঘরে, প্রবেশকক্ষের ডান দিকে চাখানায় পেগি স্কটার কাজে ব্যস্ত ছিল। পেগি স্কটার ছিল মজবুত অথচ ছিমছাম গড়নের মেয়ে, তার মুখে মেছেতার দাগ, নাকটা বড়ি-বসানো; তার ছাইরঙা চোখের দৃষ্টিতে গাম্ভীর্য আর জিজ্ঞাসার চিহ্ন, এক ডজন মজবুত হেয়ার পিন দিয়ে মাথার পেছনে জড় করে বাঁধা তার গাঢ় কটা রঙের চুল চকচক করত চমৎকার মাজাঘষা ব্রোঞ্জের মতো।

তার সহকারিনীটি যখন ওপরওয়ালির লেস্‌-এ মোড়া হাতার ছাঁটটা এই নিয়ে দশ বার বুঝতে প্রবৃত্ত হচ্ছে তখন পেগি দেখতে পেল টিল্‌সকে। সে অর্ধবৃত্ত রেখা টেনে অগ্রসর হচ্ছিল, থেকে থেকে থমকে দাঁড়িয়ে পরিচিত খদ্দেরদের উদ্দেশে বিনীত ভাবে মাথা নোয়াচ্ছিল।

একটা বিরাট মাটির সরার ওপর বেছে বেছে বিস্কুট সাজিয়ে রাখতে রাখতে পেগি বলল, "ঐ দেখ মেলি কম্যান্‌ডান্‌ট এসেছে। এদিকেই আসছে আসছে দেখছি। বটে, বটে, গুটি গুটি আসা হচ্ছে, বুড়ো বক্কেশ্বর!"

দূর থেকেই পেগির উদ্দেশে টিল্‌স মাথা নোয়াল, তারপর একেবারে কাউণ্টারের গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। পেগি তার দিকে দৃষ্টি মেলল, যেন জানতে চাইল তার বার্ধক্য আর দিনের খাটুনি সম্পর্কে, তার রহস্যময় অনুষ্ঠানসর্বস্ব মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল।

“পরম শ্রদ্ধেয়া, সদাপ্রফুল্ল...” শুরু করল টিল্‌স, কিন্তু চোখ পিটপিট করতে করতে
শেষ করল মৃদুস্বরে: “আশা করি, যাত্রাটা ভালোই হয়েছে।... মাফ্ করবেন, আমি অবশ্য বলতে গিয়েছিলাম অন্য কথা। চমৎকার সন্ধ্যা, আমার ত তাই মনে হয়। কেমন আছেন?”

“খাবেন কম্যান্‌ডান্‌ট?” কম্যান্‌ডান্‌টের দিকে একটা বিস্কুট বাড়িয়ে দিয়ে পেগি বলল। “উইলিয়াম ব্র্যাণ্টের স্বাস্থ্য কামনা করে খান। কিছু দিন আগে ওর কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। ও শিগ্‌গিরই ফিরে আসবে। দুসপ্তাহ আগে এই কথা লিখেছে। ও যখন আসবে তখন আমি ঐ ছোট টেবিলটাতে আপনার জন্য ডিক্যান্‌টারে করে খাসা রাম দেব... চা ছাড়াই, আর নিজেও বসব, কিন্তু এখন বুঝলেন, সরে যান, কেন না ওয়েটাররা যে ভাবে ট্রে নিয়ে ছুটোছুটি করছে তাতে আপনি ওদের ধাক্কা খেতে পারেন।”

“আপনাকে ধন্যবাদ,” বিস্কুটটা ধীরে ধীরে পকেটে গুঁজে রাখতে রাখতে কম্যান্‌ডান্‌ট বলল। “হ্যাঁ... যখন ব্র্যাণ্ট আসবে। পেগি, পেগি!” হঠাৎ তার মুখ ফসকে বেরিয়ে এলো।

কিন্তু এর বেশি আর কিছু সে বলতে পারল না, কেবল তার বলিরেখা আঁকা গালদুটি কেঁপে উঠল। তার দৃষ্টি জলে ঝাপসা আর বিমূঢ় দেখাল।

পেগি অবাক হয়ে গেল, কেন না এরকম অন্তরঙ্গতা কম্যান্‌ডান্‌ট কোন কালে দেখায় নি। পেগি অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল, এমন কি ঝুঁকে পড়ল।

কথা শেষ করা টিল্‌সের সাহসে কুলাল না — আনন্দোচ্ছল ফুলের রাশি আর সুন্দর সুন্দর বাসনে ভর্তি এই আনন্দোচ্ছল কাউণ্টারের পেছন থেকে এক নারীর উন্মত্ত চিৎকারে সমস্ত হল্-ঘর পরিপূরিত হয়ে উঠবে এটা সে হতে দিতে পারে না। যেটুকু বায়ু নিশ্বাসের সঙ্গে বার করে দিলে ব্র্যাণ্ট সম্পর্কে কথা বলে সে পেগিকে পর্যুদস্ত করতে পারত, নার্ভাস হয়ে সেটা সে গিলে ফেলল, একটা ঘুরপাক খাওয়া লাট্টুর মতো, কায়দা করে সামনে-পেছনে ঘুরে ঘুরে মাথা নোয়াতে নোয়াতে ভয়ে ভয়ে সে এক পা দু পা করে পিছু হটতে লাগল।

হাতার ছাঁট সম্পর্কে মেলির সঙ্গে তার কোন কথা পেগি বলল না। “পেগি, পেগি!” — টিল্‌সের এই কথাগুলি তার মাথার ভেতরে কেমন যেন খটকা ধরিয়ে দিল। সে পুরো এক ঘণ্টা ধরে ব্র্যাণ্টের কথা ভাবল, ভাবতে ভাবতে সে বিষণ্ণ হয়ে পড়ল একটা নিভন্ত দীপশিখার মতো, শেষ পর্যন্ত কাউণ্টারের মার্বেল পাথরে বাঁধানো ডেস্কের ওপর দড়াম করে ঘুষি মারল।

“কী বোকা আমি! ওকে থামালাম না কেন?” পেগি বিড়বিড় করে বলল। “আমাকে যেন উতলা করে তুলল!”

“আরে আপনি কি বুঝতে পারলেন না যে কম্যান্‌ডান্‌ট নেশার ঘোরে আছে?” মেলি বলল। “ওর মুখ থেকে গন্ধ বেরোচ্ছিল, আমি টের পেয়েছি।”

একথা শোনার পর পেগির মনের ফুর্তি ফিরে এলো, কিন্তু সেই মুহূর্ত থেকে তার মনের ভেতরে একটা কালো বিন্দু বসে রইল, আর কয়েক দিন বাদে সে যখন টিল্‌সের বোনের কাছ থেকে লিখিত সংবাদ পেল তখন এই কালো বিন্দুটিই নিদারুণ ধাক্কা সামলে উঠতে তাকে সাহায্য করল।

“এই যে আমি এলাম দিদি,” টিল্‌স অবশেষে বাড়িতে হাজির হয়ে বলল তার বোনকে। প্রৌঢ়া তখন ঘরের এক কোণে সেলাইকল নিয়ে কাজে ব্যস্ত। “বড় ক্লান্ত। মনে হচ্ছে সবই

ভালো, সবাই সুস্থ। যাত্রা ভালোয় ভালোয় কেটেছে। 'লা ত্রাভিয়াতা', 'স্টেলা,', 'আব্রাহাম রেপ' আর 'রেকর্ডে' গিয়েছিলাম। ক্যাপ্টেন হাল্‌টনের সঙ্গে দেখা হল। "কী খবর?" ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করলেন। বললেন, "সাবাস টিল্‌স, ধন্য বলতে হয় আপনাকে! এখনও বাতাসের দিকে পাল উড়িয়ে ধরে রাখতে পারেন।" আমাকে থিয়েটার যাবার নেমন্তন্ন করলেন। কিন্তু লোকজনের অত হৈ হৈ আমার পোষায় না — লজ্জা পাই। আমরা একটু মদ খেলাম। ক্যাপ্টেন আমাকে দিলেন বিস্কুট, এক ডলার আর... আর... না, আমি ভুল করলাম, বিস্কুট দিয়েছে পেগি স্কটার। ওর হবু বর মারা গেছে। একটা অপ্রীতিকর কাজের ভার, কিন্তু সাহসের সঙ্গে কাজটা করলাম। ওঃ সে কি কান্নাকাটি, চিৎকার... আমি চলে গেলাম।"

"পেগিকে তুমি কিছুই বল নি ভাই," রেবেকা বলল। "আমি তোমাকে ভালো জানি। শুয়ে পড়াক। যদি খেতে চাও ত তাক থেকে বাটি নাও — কাটলেট আছে।"

এক বছর কেটে গেল। আবার 'রেকর্ড' এলো। কিন্তু কম্যান্‌ডান্‌ট এলো না — সুপ গলায় বেধে বিষম খেয়ে বেদম কাশতে কাশতে সে মারা যায়। টিল্‌স এত বেশিক্ষণ কাশে আর হাঁসফাঁস করতে থাকে যে তার দুর্বল গলার ভেতরের একটা রক্তবাহী শিরা ছিঁড়ে যায়; বৃদ্ধ নিস্তেজ হয়ে শুয়ে পড়ে, দু দিন বাদে মারা যায়।

"কিসের যেন একটা অভাব বোধ হচ্ছে," সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে বাট্‌লারকে বলল ল্যাম্পটন। "কে এখন আমাদের নানা রকমের খবর দেবে?"

কথাগুলি শেষ হতে না হতে প্রথমে ডেকের ওপর, তারপর নাবিকদের কোয়ার্টারে দ্রুত এসে প্রবেশ করল খালি পায়ে, জংলী, নির্লজ্জ চেহারার, লালমুখো এক ঢ্যাঙা ছোকরা।

"কী খবর?" বিশ্রী ধরনের টুপিটা নাড়িয়ে গাঁক গাঁক করে সে বলল। "কি গো জাহাজীরা, ট্রিপ কেমন হল? যাত্রা ভালো হয়েছে ত? পরিবারের সকলে বেঁচে বর্তে আছে? কী হল? হল কী? এক গেলাস ঢালুন দেখি চটপট!"

"তুই কে রে?" বাট্‌লার জিজ্ঞেস করল।

"পোর্টের কম্যান্‌ডান্‌ট! টিল্‌স পটল তুলেছে, আমি... আমি তার জায়গা নিয়েছি।"

ল্যাম্পটন তিক্ত হাসি হাসল, নীরবে উঠে দাঁড়িয়ে ছোকরার কনুই ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে তাকে তীরের সদর রাস্তার ওপর বার করে দিয়ে এলো।

"বিদায়!" নাবিক বলল। "আর এখানে পা বাড়াবি না।"

"তাজ্জব ব্যাপার!" নিরাপদ দূরত্বে সরে যাবার পর ছোকরা গলা চড়িয়ে বলল। "তোমার বুটজুতো যদি খোয়া যায় তাহলে নতুন একজোড়া কিনবে কি না? আমি তো তোমাদের ভালোই করতে চেয়েছিলাম — ছ্যাঁচরা, রাস্কেল, বদমাশ, হাঙ্গর-কুমীরে তোদের ধরে খাক!"

"না, না," মূর্খটার কথার রাগ না করে ডেক থেকে জবাব দিল ল্যাম্পটন। "ডাহা জাল। তোর ঐ হাঁ থেকে কখনও বেরোবে না যেমন ভাবে জিজ্ঞেস করা উচিত: "যাত্রা ভালোয় ভালোয় কেটেছ ত?"

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জা বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে আমরা বাধিত হব।

আশা করি আপনাদের মাতৃভাষায় অনূদিত রুশ ও সোভিয়েত সাহিত্য আমাদের দেশের জনগণের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক হবে।

আমাদের ঠিকানা:
'রাদুগা' প্রকাশন
১৭, জুবোভ্স্কি বুলভার
মস্কো ১১৯০২১, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Перевод сделан по книге:
Александр Грин. Избранное. Ленинград, 1975

Для среднего школьного возраста.

ИБ № 108

Редактор русского текста: *М. Е. Шумская*
Контрольный редактор: *В. Л. Коровин*
Художник *М. А. Дорохов*
Художественный редактор *С. Е. Барабаш*
Технический редактор *Л. Б. Чуева*
Корректор *Л. Л. Михайлова*

Сдано в набор 2.01.84 г. Подписано в печать 14.12.1984.
Формат 70×90¹/₁₆. Бумага типографская. Гарнитура бенгали.
Печать высокая. Прив. печ. л. 7,61. Усл. кр.-отт. 13,31. Уч.-изд. л. 9,84.
Тираж 10 000 экз. Заказ № 12. Цена 98 к. Изд. № 35923.

Издательство «Радуга»
Государственного комитета СССР
по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли.
Москва, 119859, Зубовский бульвар, 17.

Ордена Трудового Красного Знамени
Московская типография № 7 «Искра революции»
«Союзполиграфпрома» Государственного
комитета СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
Москва, 121019, пер. Аксакова, 13.